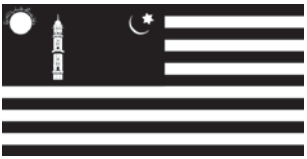

নও মোবাঈন গাইড বুক

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

নও মোবাঈন
গাইড বুক

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

নও মোবাঈন
গাইড বুক

গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.
প্রকাশক	মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
সংকলক	মো: ইলিয়াস হোসেন মোহতামীম নও মোবাঈন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সংখ্যা	৫০০ কপি
মুদ্রণ	রেইনবো মিডিয়া কমিউনিকেশন রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

Nau Moba'yeen Guide Book
(নও মোবাঈন গাইড বুক)

Compiled by **Md. Ilias Hossain**
Mohtamim Nau Moba'yeen
Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Bangladesh

1st Published in Bangladesh in February, 2023

Published by
Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publication Ltd. U.K.**

ISBN 978-984-994-005-0

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন হারানো ঈমানকে উদ্ধার করতে তথা ইসলামের হারানো গৌরবকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। তাই তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্যদের মধ্যে আহমদীয়াত তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। সেই একই লক্ষ্যে এই জামা'তে নবাগত সদস্যদেরও জামা'তের মৌলিক বিষয়াবলীর ওপর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের নও মোবাঈন বিভাগের অধীনে নও মোবাঈনদের (নতুন আহমদী) জন্য একটি গাইড বুক প্রকাশ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই গাইড বুকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি ও আকীদা, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী ও ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি এই গাইড বুকের মাধ্যমে সকল নও মোবাঈন উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ্। আর এ থেকে প্রকৃত অর্থেই যদি কেউ উপকৃত হন তবেই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

এ বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষকরে মরকযী বাংলা ডেস্ক, লন্ডন এর ইনচার্জ মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব ও মাওলানা মোবারিজ আহমদ সানী সাহেব। তারা শত ব্যস্ততার মাঝেও এ বইটির প্রুফসহ পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের কাজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এ পুস্তকের কাজে জড়িত সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আমাদের সকলের উত্তম সাথি হোন, আমীন।

খাকসার

মুহাম্মদ জাহেদ আলী
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

ঢাকা
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

সূচীপত্র

১. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি ৫
২. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস ৫
৩. ইসলামের রুকন পাঁচটি ৭
৪. হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু প্রসঙ্গ ১৮
৫. খাতামান্নাবীঈন ২৩
৬. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর দাবির সত্যতা ২৫
৭. মহানবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৭
৮. মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম এবং পরিচয় ২৮
৯. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৯
১০. খিলাফত ৩০
১১. ইমাম মাহদী (আ.) ও আহমদীয়া খলীফাগণের নাম এবং পরিচয় ৩৬
১২. প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) কেন পৃথিবীতে আগমন করেছেন? ৩৭
১৩ . প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করা জরুরি কেন? ৩৯
১৪. হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে না মানার পরিণাম ৪০
১৫. নেযামে জামা'ত (জামা'তের ব্যবস্থাপনা) ৪২
১৬. অঙ্গসংগঠনসমূহের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল ৪৩
১৭. খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামা ৪৩
১৮. আতফালুল আহমদীয়ার আহাদনামা ৪৪
১৯. মজলিসে আনসারুল্লাহর আহাদনামা ৪৪
২০. লাজনা ইমাইল্লাহ্র আহাদনামা ৪৫
২১. নাসেরাতুল আহমদীয়ার আহাদনামা ৪৫
২২. আমরা কেন চাঁদা দেই ৪৬
২৩. তাহরীকে জাদীদ (নতুন ঘোষণা) ৪৯
২৪. ওয়াকফে জাদীদ (নতুন উৎসর্গ) ৫০
২৫. উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজাদ্দেদগণের নাম ৫১
২৬. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত ৫২
২৭. আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৫৩
২৮. নও মোবাঈন অর্থাৎ নতুন বয়আতকারীদের করণীয় ৫৬

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করে একদিকে যেমন উম্মতের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন তেমনিভাবে শেষ যুগের অবক্ষয় ও অধঃপতন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। যেমন মিশকাত শরীফে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন,

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُه ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُه ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرِابٌ مِنَ الْهُدَى ، عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ

"মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলাম কেবল নামমাত্র এবং কুরআনের অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়েতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফিৎনা-ফাসাদ জন্ম নিবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।" *(বায়হাকী, মিশকাত)*

রসূলুল্লাহ (সা.) শুধু অধঃপতনের কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি বরং এ থেকে উত্তরণের সুসংবাদও দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "কাইফা তাহলিকু উম্মাতি আনা আওয়ালুহা ওয়া ঈসা ইবনু মারইয়ামা আখেরুহা" (কানযুল উম্মাল)। অর্থ: সেই উম্মত কিভাবে ধ্বংস হতে পারে যার শুরুতে আমি এবং শেষে ঈসা ইবনে মরিয়ম।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ৬০০ বছর পূর্বে বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম মারা গেছেন। তাই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর তাৎপর্য এটিই দাঁড়ায়, শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপক অর্থে ঈসা ইবনে মরিয়ম হবেন। আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই রূপক ঈসা হবার দাবি করেছেন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ২৩ শে মার্চ ১৮৮৯ সনে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলেছেন:

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদেনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং

আমরা আরো ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**-এর ওপর ঈমান রাখে এবং এ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্যকরণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের ওপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযূর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, সেসব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোনো দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযিবীনা ওয়াল মুফতারীনা" অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। *(আইয়ামুস্ সুলেহ্ পুস্তক, পৃ. ৮৬-৮৭)*

* আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল ত্রুটি ও অপবিত্রতার উর্ধ্বে।

* ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। আল্লাহ্ যা নির্দেশ দেন ফেরেশতারা তাই করেন।

* সকল ঐশী গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনা। পবিত্র কুরআন শেষ ঐশী শরীয়তগ্রন্থ। যার কোনো শিক্ষা, বিধান, শব্দ, এমনকি অক্ষরও কেয়ামত পর্যন্ত রহিত হবে না।

* আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত সকল নবী রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মান্য করা। শরীয়তের বাহক হিসেবেও তিনি শেষ নবী এবং মর্যাদার চরম শিখরের দিক থেকেও তিনি শেষ নবী। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন।

* পরকাল এবং তকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

আমাদের ঈমানী আকীদাঃ

"আন উমারাবনিল খাত্তাবি ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল ঈমানু আন তু'মিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া তু'মিনা বিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শার্‌রিহি।" *(মুসলিম)*

অর্থ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ঈমান হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।

ইসলামের রুকন পাঁচটি

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ "

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: ক) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল; খ) নামায প্রতিষ্ঠা করা; গ) যাকাত প্রদান করা; ঘ) রমযানের রোযা রাখা এবং ঙ) বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব সম্পাদন করা। *(জামে আত্ তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর: ২৬০৯)*

কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ।

কলেমা

কলেমা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংবলিত কয়েকটি আরবী শব্দের সমষ্টি। এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম স্তম্ভ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইসলামী পরিভাষায় কলেমা বলতে নিম্নের বাক্যটিকে বুঝায়–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ **(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)**

অর্থ: "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল।"

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত মহানবী (সা.) বলেন, সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং সর্বোত্তম দোয়া হলো 'আলহামদুলিল্লাহ্'। *(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

মহানবী (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে একনিষ্ঠতার সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(মুসনাদ আহমদ)*

হযরত ইতবান বিন মালিক হতে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলবে এবং এ বিশ্বাস সহকারে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তার ওপর আল্লাহ্ জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নম্বর: ৬৪২৩)*

এ সম্পর্কে যুগ ইমাম হযরত আকদাস ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

মুক্তির নিবাসে প্রবেশ করার দরজা হচ্ছে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ *(হুজ্জাতুল ইসলাম)*

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রসূল।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইসলামের কলেমা সম্পর্কে বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"–ই আহমদীয়াত (তথা খাঁটি ইসলাম)– এর কলেমা।

কলেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল। *[সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত, হাদীস নম্বর: ৪৪২]*

নামায

নামায ফারসি শব্দ। এর আরবী হলো 'সালাত'। নামায বা সালাত কায়েম করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া বা প্রার্থনা। মানুষের জন্যে এই প্রার্থনার বিধান দান করে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। নামাযের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে পারি, পাপ হতে মুক্তি লাভ করতে পারি। নামায মানুষকে খারাপ কাজ, মন্দ কথাবার্তা, লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ প্রভৃতি হতে রক্ষা করে। নামায বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাথেয় এবং মু'মিনদের মে'রাজ। নামায বেহেশতের চাবি। একে ধর্মের স্তম্ভ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

(ইন্নাস্ সালাতা তানহা আ'নিল ফাহ্শায়ি ওয়াল মুনকার)

অর্থ: নিশ্চয়ই নামায (নামাযীকে) অশ্লীলতা এবং মন্দকাজ হতে মুক্ত করে।" *(সূরা আনকাবুত: ৪৬)*

আমরা সাধারণত নামায পড়ি বা নামায পড়া বলে থাকি। নামায পড়া কথাটি একদমই সাধারণ কথা যার মধ্যে মনোযোগ থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, **'আক্বীমুস্ সালাত'** অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে চান সেভাবে নামাযকে প্রতিষ্ঠা করাই হলো **'আক্বীমুস্ সালাত'**। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই নামায জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু পূর্ব থেকেই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এমন কোনো নবী-রসূল জগতে আসেন নি যিনি এই নামাযকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করেন নি।

নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

দিনে পাঁচবার নামায পড়া ফরয। এ পাঁচবার নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হচ্ছে:
ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা।

- **ফজর:** ভোরের আলো প্রকাশের শুরু হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত।
- **যোহর:** দুপুরের সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার অনুরূপ হওয়া পর্যন্ত। ঘড়ির সময়ানুযায়ী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যোহরের সম্পূর্ণ সময় প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে থাকে। যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছুটা দেরি করে আর শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।
- **আসর:** প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হবার পর থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশে লালবর্ণ ধারণ করার আগে তথা সূর্য-ডোবার পূর্ব পর্যন্ত।
- **মাগরিব:** সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে পশ্চিমাকাশে লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
- **এশা:** সূর্য ডোবার এক বা সোয়া ঘণ্টা পর– অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত। তবে মধ্য রাত পর্যন্ত সর্ব উত্তম সময়।

মেরু অঞ্চলে যেখানে দিন বা রাত্রি অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে সেখানে সময় অনুমান করে ঘড়ির সময়ানুসারে নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করতে হবে। *(ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৩৭-৩৮)*

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

নিম্নোক্ত সময়ে যে কোনো ধরনের ফরয কিংবা নফল নামায পড়া নিষেধ।
(১) সূর্য উদিত হবার সময় থেকে এক বর্শা পরিমাণ ওপরে ওঠা পর্যন্ত।
(২) ঠিক দুপুরবেলা যখন সূর্য একেবারে মাথার ওপরে থাকে।
(৩) সূর্য অস্তমিত হবার সময়।

নামাযের রাকা'ত

নামাযের নাম	প্রথম সুন্নত	ফরয	শেষের সুন্নত	নফল
ফজর	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত		
যোহর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
আসর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত		
মাগরিব		৩ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
এশা	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত

বিতরঃ এশার নামাযের পর তিন রাকা'ত বিতর নামায পড়তে হয়। এটা ওয়াজিব। অথবা শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পরও এ নামায পড়া যায়। বিতর নামায তিন রাকা'ত একসাথে পড়া যায় আবার দুই রাকা'তের পর সালাম ফিরিয়ে এক রাকা'ত আলাদাও পড়া যায়।

একটি হাদীসে নামাযের বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

"পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারটি আসলে এরকম, কোনো ব্যক্তির ঘরের পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় আর সে সেখানে পাঁচ বার একদিনে গোসল করে। ফলে তার শরীরে আর কোনো ময়লা থাকে না।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ) অর্থ হলো, মসজিদে গিয়ে প্রত্যহ পাঁচ বেলার নামায জামা'তের সাথে আদায় করতে হবে।

নামাযের কাজ কী– এ বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সেই অন্তঃকরণ যা পাপে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান অর্জন হতে দূরে পড়ে আছে, তাকে পবিত্র করা এবং দূর হতে নিকটে আনাই নামাযের কাজ।" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "যখনই দুঃখ বা বিপদের সম্মুখীন হও তখনই সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ খোদার সমীপে খোলাখুলিভাবে পেশ করো। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আছেন এবং একমাত্র তিনিই যিনি প্রত্যেক প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ হতে মানুষকে উদ্ধার করেন। *(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১০)*

রোযা

ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রুকন সিয়াম বা রোযা পালন। চান্দ্র বছরের নবম মাসের নাম রমযান। রমযান মাসের নাম পূর্বে ছিল 'নাতেক' *(তফসীর গ্রন্থ ফাতহ আল-কাদীর)*। রমযান শব্দটি 'রময' মূল ধাতু হতে এসেছে। এর অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আ'লাইকুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আ'লাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ওপর এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। *(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৪)*

রোযাকে ফরয করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ রোযার নির্দেশ কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এবং এতে কোনো অসহনীয় কষ্টও নেই। ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিশ্বের সব ধর্মেই রোযা অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেছেন,

"আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে একে রমযান বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আরব দেশের জন্যে এতে কোনো বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্মকর্মে উদ্দীপনা। রময এমন উত্তাপকেও বলা হয় যাতে পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয়।" *(আল হাকাম, ২৪ জুলাই, ১৯০১)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন: "আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারাবছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে আরো একটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যে দৈনিক পাঁচবারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারাবছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোনো ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সামনে এসে দাঁড়ালেও সে তাকে দেখতে পায় না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক কোনো রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করালে যদি সে রুগী মনে করে যে, সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে, তাহলে তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ

যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্যে কল্যাণজনক। তদ্রূপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার ওপর অনুগ্রহ করে না; বরং এটা তার ওপর খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এই দিনগুলোকে যত বেশি সদ্ব্যবহার করবো, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে, যেগুলো ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।" *(দৈনিক আল্ ফযল: ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৫)*

রোযার প্রকারভেদ

রোযা সাধারণত দুই প্রকার: ১) ফরয রোযা, ২) নফল রোযা। ফরয রোযার উদাহরণ হচ্ছে- রমযানের রোযা, রমযানের (ছুটে যাওয়া) রোযার কাযা, যিহারের (স্ত্রীকে মা বলে ফেলার কারণে) কাফফারার রোযা, জেনে-শুনে রোযা ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাফফারার ৬০টি রোযা, কসম খাওয়ার কাফফারার রোযা, মানতের রোযা ইত্যাদি। আর নফল রোযার উদাহরণ হচ্ছে– শাওয়ালের ৬ রোযা, আশুরার রোযা, হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা– অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে একদিন খাবার খাবে– এভাবে ধারাবাহিকভাবে নফল রোযা রাখা, আরাফাতের দিনের রোযা, প্রত্যেক চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখা ইত্যাদি। *(ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭২)*

* সোম ও বৃহস্পতিবার যা যুগ খলীফার বিশেষ তাহরীকের অধীনে রাখা হয় এটাও নফল রোযার অন্তর্ভুক্ত।

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

(শাহ্রু রামাযানাল্লাযী উন্যিলা ফীহিলো কুরআন)

অর্থাৎ, "রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন।" *(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৬)*

রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো, এ পবিত্র মাসে কুরআন করীম নাযিল করা হয়েছিল। আর প্রতি বছর এ মাসে জীব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হতো, তা পুনরাবৃত্তি করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে হযরত জীব্রাঈল (আ.) তাঁর কাছে দু'বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন করীম আবৃত্তি করেন *(বুখারী)*। এতে তিনি বুঝতে পারেন, কুরআন করীম নাযিল হওয়া সমাপ্ত হয়েছে।

রোযা রেখে কুরআন করীম পাঠ করা, এর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অনুশাসনাদি পালন করার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক দর্শনশক্তি সতেজ হয়। সে শয়তানি চিন্তাভাবনা ও প্রভাব হতে নিরাপদ থাকে। অধিকন্তু মানুষ এক অনাবিল

আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এবং পরম সম্পদ লাভ করে– যা শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সহীহ্ হাদীসে আছে, যখন রমযান মাস আসে তখন বেহেশতের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। রোযা মু'মিনের জন্যে ঢালস্বরূপ। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি ত্যাগ করে না, আল্লাহ্র কাছে তার খাদ্য বা পানীয় পরিত্যাগ করার কোনো মূল্য নেই। রমযান মাসে এক মহিমান্বিত রাত আছে যা হাজার মাস হতে উত্তম। যাকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সে সব ধরনের মঙ্গল হতে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগা।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সার্বিক অর্থে সাধনার এক অপূর্ব সওগাত নিয়ে প্রতি বছর মাহে রমযান আসে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্যে রমযানের কৃচ্ছ্রতার মাঝে যে মহান সংকল্প ও শিক্ষা নিহিত তা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাঝেই এ মাসের সার্থকতা রয়েছে। নিছক আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতার মাঝে বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই।

যাকাত

যাকাতের অর্থ হলো মাল বা সম্পদের বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদকে পবিত্র করা। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। এটি এরূপ সদকা বা দান– যা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে গরীব এবং অভাবীকে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন–

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

(ওয়ামা আতাইতুম মিন্ যাকাতিন্ তুরীদূনা ওয়াজ্হাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মুদ'য়িফুন)

অর্থ: "আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধনসম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।" *(সূরা আর্ রূম: ৪০)*

যাকাত কার ওপর ফরয?

প্রত্যেক সুস্থ, সচেতন, প্রাপ্তবয়স্ক ধনসম্পদের অধিকারী লোক, যার কাছে নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ সোনা, রূপা, টাকা অথবা ব্যবসার পুঁজি এবং সামগ্রী, গৃহপালিত পশু পুরো এক বছর জমা থাকে তার জন্য যাকাত দেয়া ফরয। যাকাত হালালভাবে উপার্জিত সম্পদের ওপর দেয়া আবশ্যক এবং তা প্রতি বছর দিতে হয়। ঋণী ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরয নয়।

যাকাতের শর্ত বা যাকাত কখন দিতে হবে?

যার কাছে পুরো এক বছর নিসাব পরিমাণ নগদ টাকা থাকে অথবা স্বর্ণালংকার অব্যবহৃত থাকে, তাকে এর ওপর চল্লিশ ভাগের একভাগ (১/৪০) যাকাত দিতে হবে। পুরো এক বছর সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সেই মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ বা সেই মূল্যের বেশি অর্থ অথবা অলংকার থাকলে (আমাদের দেশের মুদ্রা স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের নিসাব স্বর্ণের ভিত্তিতে হবে) এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। যেসব অলংকার মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় আর তা যদি উল্লেখিত নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী থেকে তাকে তাহলে এর ওপরও উল্লেখিত হিসেবে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের পরিমাণের চেয়ে কম মূল্যের ব্যবহার্য গহনার ওপর যাকাত দিতে হবে না।

অলংকার গহনার যাকাত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "যে গহনা সব সময় ব্যবহার করা হয় এর যাকাত দিতে হবে না। এরূপ গহনা যা গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কখনো কখনো পরিধান করা হয় এবং কখনো কখনো গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় এর সম্পর্কে কারও কারও ফতোয়া হলো, এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যে গহনা মাঝে মাঝে পরিধান করা হয়, কিন্তু অন্যদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়াই উত্তম। কেননা এগুলো শুধু নিজের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমার গৃহে আমল করা হয় এবং প্রত্যেক বছরের শেষে যাকাত দেয়া হয়। যে গহনা টাকার ন্যায় সঞ্চিত রাখা হয়, এর ওপর যাকাত দেয়া সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ নেই।" *(মাজমুয়া ফাতাওয়া আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)*

চাঁদা ও যাকাত

জামা'তী চাঁদা ও যাকাত সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হলেই বিত্তশালীর জন্য তা থেকে যাকাত দেয়া আবশ্যক। জামা'তী চাঁদা জামা'তের ব্যয়নির্বাহ ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ হয়। জামা'তী সিলসিলা বা সংগঠনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চাঁদা নিবে অথবা নিবে না। তাই দু'টি বিষয়কে কখনো এক মনে করা উচিত নয়।

কোনো মুসলমানের জন্য মাল (ধনসম্পদ) কুরবানী শুধু যাকাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা আরও অনেক অধিকার পূরণ করতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "তৃতীয় বিষয় হলো (যাকাত ও সদকার পর) জামা'তের চাঁদা– যা ধর্মের জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এ জিহাদ তরবারির জিহাদ হোক বা কলম ও কিতাবের মাধ্যমেই হোক, সেটাও প্রয়োজনীয়। কেননা যাকাত এবং সদকা গরীবদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ দিয়ে বই-পুস্তক ছাপানো সম্ভব নয় বা মুবাল্লিগদেরও দেওয়া যায় না।" *(মালায়েকাতুল্লাহ্, পৃ. ৬২)*

আজকাল তরবারির বা অস্ত্রের জিহাদ নেই। সুতরাং ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা জামা'তের নেযামের দৃঢ়তার জন্য এবং এ ধরনের অন্যান্য খরচাদির জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয় তা-ই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

(জাহিদু বিআম্ওয়ালিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম)

অর্থ: তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো।" *(সূরা আত্ তওবা: ৪১)*

এ আয়াতের প্রথম অংশের ওপর আমল করা যায় চাঁদা দিয়ে, আর দ্বিতীয় অংশের ওপর আমল করা যায় কোনো কোনো সময় নিজের কাজ স্থগিত রেখে কিছু সময় তবলীগের জন্য দিয়ে অথবা ধর্মের উন্নতির জন্য তা'লীম ও তরবিয়তের কাজে অংশ নিয়ে।

সূরা আল্ বাকারার চতুর্থ আয়াতও এ কথার সমর্থন করে। অর্থাৎ, ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থ, সম্পদ, সময় এবং জ্ঞানের দ্বারা সেবা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "লাযেমী (আবশ্যিক) চাঁদা এবং হিস্যায়ে আমাদ্ (ওসীয়্যতকারীদের আয়ের অংশবিশেষ) যাকাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বস্তুত যাকাত একটি ফরয কাজ। সব রকম চাঁদা দিলেও যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। যাকাতের নিয়্যত করে চাঁদা দিলেও যাকাত আলাদাভাবে দিতে হবে।" *(মাসায়েলে যাকাত, পৃ. ১০)*

হজ্জ

হজ্ব ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্বের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী কা'বা শরীফের জিয়ারতের (দর্শনের) উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্ব বলা হয়।

হজ্বের সময়

হজ্ব করার জন্য নির্দিষ্ট মাস নির্ধারিত রয়েছে যাকে **"আশহুরুল মা'লুমাত"**– অর্থাৎ, হজ্বের মাস বলা হয়েছে। এ মাস তিনটি যথা: শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব। এগুলোকে আশহুরুল হজ্ব বা হজ্বের মাস এজন্যই বলা হয়, কেননা এ মাসগুলোতে হজ্বের প্রস্তুতি, চরিত্রগত সংশোধন এবং হজ্বের কার্যাবলী যথা ইহরাম বাঁধার সূচনা হয়ে যায়। আর এ হজ্বের সর্বশেষ সময়সীমা যিলহজ্ব মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কুরআন করীমের সূরা আল্ বাকারার ১৯৮ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

হজ্ব কাদের ওপর ফরয?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

"ওয়ালিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্বুল বাইতি মানিস্তাতাআ ইলাইহি সাবীলা" অর্থাৎ, "কা'বাগৃহের হজ্ব সেসব লোকের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।" *(সূরা আলে ইমরান: ৯৮)*

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করলো না, সে ইহুদী না খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করলো, সে বিষয়ে আমার কোনো পরোয়া নেই।" *(তিরমিযী)*

নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারীর ওপরেই হজ্ব ফরয করা হয়েছে:

(১) মুসলমান।

(২) সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

(৩) প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান।

(৪) সংসার পরিচালনার পর হজ্বে যাওয়ার মত আর্থিক সংগতি এবং হজ্ব থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর ব্যবস্থা যার আছে।

(৫) রাস্তার নিরাপত্তা।

(৬) স্ত্রীলোকের জন্য মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ) সঙ্গী থাকা। স্ত্রীলোকের মাহরাম সঙ্গী না নিয়ে হজ্বযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা সূরা আল্ বাকারার ১৯৮ নম্বর আয়াতে হজ্বযাত্রীকে উপযুক্ত পাথেয় সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হজ্বের প্রকারভেদ

হজ্ব তিন প্রকার। তা হলো–

(১) **হজ্বে মুফরাদ:** সেই হজ্ব যাতে মিকাত (এমন স্থান যেখান থেকে মক্কায় আসার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয়) হতে শুধুমাত্র হজ্ব করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয়। এতে উমরাহ্ করতে হয় না।

(২) **হজ্বে তামাত্তো:** তামাত্তো শব্দের অর্থ হলো, লাভবান হওয়া। অর্থাৎ, হাজীর একই সফরে দু'টি কল্যাণ লাভ করা। প্রথমতঃ উমরাহ করা, দ্বিতীয়তঃ হজ্ব করা। এ জন্য হাজী হজ্বের মাসগুলোতে সর্বপ্রথম শুধু উমরাহ্র জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ্র পর– অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ্র তোয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে

সাত চক্কর দেয়ার পর মাথার চুল কর্তন করে ইহরাম খুলে ফেলবে। এরপর ৮ যিলহজ্ব বা এর পূর্বে নতুন করে হজ্বের ইহরাম বেঁধে হজ্বের অনুষ্ঠান পূর্ণ করবে। হজ্বে মুফরাদ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্ব কুরবানী আবশ্যক নয়, কিন্তু হজ্বে তামাত্তো পালনকারী ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্ব কুরবানী করা আবশ্যক। যদি কুরবানী দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখবে। এর মধ্যে থেকে তিনটি হজ্বের দিনগুলোতে– অর্থাৎ, ৭, ৮ ৯ যিলহজ্ব তারিখে আর বাকী সাতটি রোযা ঘরে ফিরে আসার পর রাখতে হবে।

(৩) **হজ্বে কিরান:** হজ্বে কিরান এমন হজ্বকে বলা হয়, যাতে মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) হতে হজ্ব এবং উমরাহ্ উভয় একসাথে আদায় করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম উমরাহ্ করবে তারপর ইহরাম না খুলে সে ইহরামেই হজ্বের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করবে। হজ্বে কিরান সম্পাদনকারী ব্যক্তির জন্যও ১০ যিলহজ্ব কুরবানী করা আবশ্যক। অন্যথায় উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী রোযা রাখবে।

হজ্বের রোকন

হজ্বের তিনটি রোকন বা ফরয (অবশ্য পালনীয়) কর্ম রয়েছে। এগুলো হলো–

১) ইহরাম অর্থাৎ, নিয়ত করা।

২) উকূফে আরাফাহ– অর্থাৎ ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে অবস্থান।

৩) তোয়াফে যিয়ারত যাকে তোয়াফে ইফাযা-ও বলা হয়। অর্থাৎ, সে তোয়াফ যা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্ব অথবা এর পরবর্তী তারিখগুলোতে কা'বাগৃহে করা হয়ে থাকে। ৯ যিলহজ্ব যদি কোনো ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান না করতে পারে তাহলে তার হজ্ব হবে না। তাকে পুনরায় পরবর্তী বছর ইহরাম বেঁধে হজ্ব করতে হবে।

মানাসিকে হজ্ব বা হজ্বের আচার-অনুষ্ঠানাবলী

(ক) ইহরাম, (খ) তোয়াফ বা বায়তুল্লাহ্ পরিক্রমণ, (গ) সায়ী বা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত চক্কর দেয়া, (ঘ) উকূফে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান, (ঙ) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান, (চ) রমি বা কংকর নিক্ষেপ করা, (ছ) কুরবানী করা, (জ) তোয়াফে বিদা প্রভৃতি।

হজ্ব ও উমরাহ

৮ যিলহজ্ব হতে ১৩ যিলহজ্ব সময়ের মাঝে অনুষ্ঠিত শরীয়ত নির্ধারিত কর্মকে হজ্ব বলে। বছরের অন্যান্য দিনে ইহরামের সাথে 'তোয়াফ' ও 'সায়ী' করাকে 'উমরাহ্'

বলে। ফরয নামাযের সাথে যেরূপ সুন্নত ও নফল নামায পড়ার রীতি আছে, তদ্রূপ হজ্বের আগে ও পরে রোযার ব্যবস্থা রয়েছে। *(বিস্তারিত অবগতির জন্য সূরা আল্ বাকারার ২৪ নং রুকু ও সূরা আল্ মায়েদার ১৩ রুকু দ্রষ্টব্য)।*

মাসলা মাসায়েল

*** ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ**

*** খতমে নবুওয়তের কল্যাণে উম্মতী নবীর ধারা চলমান**

*** সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রমাণ**

হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু প্রসঙ্গ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, শেষ যুগে তাঁর উম্মতের চরম অবক্ষয়ের সময় তাদের উত্তরণের জন্য একজন মসীহ্ আসবেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই মসীহ্ কে হবেন? বনী ইসরাঈলের নবী হযরত ঈসা (আ.) নাকি তার রঙে রঙিন হয়ে রূপক কেউ এ প্রতিশ্রুতি অনুসারে আসবেন? বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা মসীহ্ (আ.) যদি জীবিত থেকে থাকেন তাহলে প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনিই আবির্ভূত হবেন আর তিনি মারা গিয়ে থাকলে তার আসার সুযোগ নেই। কেননা কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসতে পারবে না। এ কারণে ঈসা (আ.) জীবিত না মৃত এ বিষয়টি মীমাংসা করা আবশ্যকীয়।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ

(ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির্ রুসুল। আফাইম্মাতা আও ক্বুতিলানক্বালাবতুম আলা আ'ক্বাবিকুম।)

অর্থ: "এবং মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না; তার পূর্বেকার সকল রসূল নিশ্চয়ই গত হয়ে গেছে। অতএব, সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে (তৎক্ষণাৎ) ফিরে যাবে?" *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)*

এই আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব রসূল গত হয়েছেন। একই রীতি অনুসারে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) গত হয়ে যান তাহলে আশ্চর্যের কী আছে?

মহানবী (সা.) সম্পর্কে কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনি ইন্তেকাল করতে পারেন না। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর কারো কারো পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। হুযূর (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মদীনার বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে তিনি এ অবস্থা দেখেন; সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ললাটে চুমু খেয়ে

মসজিদে নববীতে গিয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। আর বলেন, "তোমাদের মধ্য হতে যারা খোদার ইবাদত করে তারা নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তিনি চিরঞ্জীব; তিনি কখনো ইন্তেকাল করেন না। অপরদিকে যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করতো তাদের জানা উচিত যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন"।

এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, যার মাধ্যমে সাহাবীরা বুঝতে পারেন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর পূর্বের নবীরাও। হযরত উমর (রা.) বলেন,"হযরত আবু বকর যখন এই আয়াত পাঠ করলেন আমার এমন মনে হলো যেন কুরআনের এই আয়াতটি প্রথমবার এখনি নাযিল হয়েছে এবং আমার পদযুগল দুর্বল হয়ে যায় আর আমার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে।"

সকল সাহাবী নিশ্চিত হলেন যে, এই আয়াত মোতাবেক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে সাহাবীরা নিশ্চিত হলেন যে, মহানবী (সা.) সহ পূর্বের সকল রসূল ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কোনো সাহাবী উচ্চবাচ্য করেন নি যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে আছেন। বুখারী শরীফে সবিস্তারে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন:

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

"হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে উন্নীত করব আমার দিকে" *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)*। এবং সূরা মায়েদার শেষাংশে আছে ঈসা (আ.) কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্র এক প্রশ্নের জবাবে বলবেন:

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ "কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত দিলে"-এবং এই 'যখন'- সময়কালটা হচ্ছে তাঁর (আ.) অনুসারীদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বের সময়। অর্থাৎ, খ্রিষ্টানরা যখন তাঁকে খোদার পুত্র খোদা বানিয়ে তাঁর উপাসনা শুরু করে দিয়েছিল তার পূর্বেই তাঁর ওফাত হয়েছিল। তাই কেয়ামতের দিনে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলবেন:

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত দিলে, তখন তুমিই তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে এবং তুমিই সকল কিছুর ওপরে সাক্ষী।" *(সূরা আল মায়েদা: ১১৮)*

'মোদ্দাকথা, খ্রিষ্টানদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কেয়ামতের দিনে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁকে অবহিত না করা পর্যন্ত ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে কিছুই জানবেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঈসা (আ.) যদি পুনরায় পৃথিবীতে আসেন, তাহলে কি তিনি দেখতে পাবেন না যে, খ্রিষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বানিয়ে তাঁর পূজা করছে? শিরক

করছে? অবশ্যই দেখতে পাবেন। এবং পৃথিবীতে পুনরায় এসে খ্রিষ্টানদের এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে তাঁর পক্ষে খোদার কাছে একথা বলা কি সম্ভব হবে যে, তিনি এসব ব্যাপারে কিছুই জানতেন না? আদৌ সম্ভব হবে না। কাজেই, এক্ষেত্রে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, ঈসা (আ.)-এর ওফাতের পরেই খ্রিষ্টানরা শিরকে লিপ্ত হয়েছে, ধর্মচ্যুত হয়েছে। আর যদি মনে করা হয় যে, ওফাত অর্থ স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া, তাহলেও ঈসা (আ.)-এর পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসা হবে না, বরং তাঁকে আকাশেই থাকতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত। কেননা তিনি পৃথিবীতে আসলেই দেখতে পাবেন যে, খ্রিষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বানিয়েছে। অতএব, ওফাত অর্থ মৃত্যু হলে তো তাঁর পক্ষে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার প্রশ্নই ওঠে না; আর যদি 'ওফাত অর্থ জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলেও ঐ আয়াতগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। কেননা ফিরে এলে তিনি দেখতে পাবেন যে, খ্রিষ্টানরা তাঁর নামে খ্রিষ্ট-বিরোধী কাজে অর্থাৎ দাজ্জালিয়াতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হতে পারতো 'হে আল্লাহ্! প্রথমে তো আমি এসব কিছুই জানতাম না, কিন্তু আমার ওফাতের পর পুনরায় আমি যখন পৃথিবীতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে, তারা তোমাকে বাদ দিয়ে আমারই উপাসনা শুরু করেছে। কিন্তু তিনি এ ধরনের কোনো কথাই বলবেন না, বরং এসব কিছু না জানার কথাই বলবেন। অতএব ঐ ওফাতের পর ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই, অবকাশও নেই।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'মওত' বা অপর কোনো শব্দ ব্যবহার না করে আল্লাহ্ তা'লা যে 'ওফাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার একটা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

'ওফাত' অর্থ স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহুদীদের দাবি ছিল যে, তাঁরা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে। আর তাদের কিতাব মোতাবেক তারা বিশ্বাস করে যে, যে ব্যক্তি নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার হয়, হয় সে কতল (নিহত) হয়ে যায়, নয়ত সে ক্রুশে মারা গিয়ে লানতী বা অভিশপ্ত হয়। এবং এইরূপ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরে আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয় না, ঊর্ধ্বগতি লাভ করে না বরং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাজেই, ইহুদীদের দাবির তাৎপর্য এটাই ছিল যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম যেহেতু নিহত হয়েছেন বা অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন সেহেতু তাঁর আত্মা আল্লাহ্র দিকে উন্নীত হয় নি-'রাফা' লাভ করে নি। ইহুদীদের এসব দাবিকেই মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলে:
بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ 'বরং তাকে রাফা দিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁর দিকে।' *(সূরা আন্ নিসা: ১৫৯)*

একথার দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ.) না নিহত হয়েছেন, না ক্রুশে মারা গেছেন, বরং তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছেন এবং তাঁর আত্মার 'রাফা' হয়েছে আল্লাহ্র দিকে। কেননা মানুষের আত্মার রাফা হয় তার মৃত্যুর পরে। জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে চলে যাওয়া বা উঠিয়ে নেয়াকে 'রাফা' বলে না। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তাদেরকে 'রাফা' দান করেন।' *(সূরা আল মুজাদেলা: ১২)*

বলাই বাহুল্য, মু'মিনদের এই রাফা হয় তাদের আত্মার উর্ধ্বগমনের মাধ্যমে, আর তা মৃত্যুর পরেই। সে কারণেই ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কথা না আছে কুরআন করীমে, না হাদীস শরীফে, এমন কি কোনোও যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসেও নেই। অদ্যবধি, কেউই দেখাতে পারেন নি, পারবেনও না। কথাটা আমরা জেনেশুনেই বলছি।

যারা বলতে চান যে, 'ওফাত' অর্থ আকাশে উঠিয়ে নেয়া, তাঁরা এটা খেয়াল করেন না যে, আল্লাহ্ তো বলেছেন, 'আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং রাফা দিব'। এখানে 'ওফাত' অর্থ যদি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, তাহলে ঐ কথার অর্থ হবে 'আমি তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নিব এবং স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিব'। সেক্ষেত্রে এই বাক্যটি হবে একটি ত্রুটিপূর্ণ ও দ্বিরুক্তিবাচক (Totology) বাক্য, কিন্তু আল্লাহ্র কথায় কোনো ত্রুটি থাকে না, দ্বিরুক্তি থাকে না। আল্লাহ্র তো কোনোভাবেই কোনো ত্রুটি নেই। অতএব আল্লাহ্র ঐ কথার অর্থ এটাই যে, হে ঈসা আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব–তুমি নিহতও হবে না, অভিশপ্ত মৃত্যুও বরণ করবে না– এবং আমি তোমার আত্মাকে আমার দিকে উন্নীত করবো। এবং ঈসা (আ.)ও বলছেন, যখন তুমি আমাকে ওফাত– অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু দিলে, তার পরের খবরাখবর তুমিই জান। এরপরও কেউ যদি বলতেই থাকেন যে, ঈসা (আ.) অদ্যবধি দু'হাজার বছর ধরে বেঁচেই আছেন আকাশে কোথাও, তাহলে খোদার কালাম বিরোধী সেই কথাটা বলার দায়দায়িত্ব তাঁরই। মনে রাখা দরকার যে, ওফাত দেওয়ার কর্তা যখন আল্লাহ্ হন, তখন ওফাতের অর্থ 'জান কবয' করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

এরপরও যদি কেউ বলেন যে, ঈসা (আ.)-কে জীবিতই স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তাহলে তাকেই পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ করতে হবে যে, ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং আকাশে আজও তিনি জীবিতই আছেন, মারা যান নি এবং তাঁর নিজের জন্য তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীও আছে যে, তিনি আকাশ থেকে স্বশরীরে অবতীর্ণ হবেন।

আল্লাহ্ পাক জন্ম নেন নি এবং কাউকে জন্ম দেন নি বা দেন না এ কথা বলার বা শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কি ঈসা (আ.)-এর ছিল?– না, ছিল না।

সুতরাং যদি ধারণা করা হয় যে, ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আবারও আগমন করবেন, তাহলে তো তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য হওয়া উচিৎ তাঁর অনুসারীদের অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের

কাছে এ কথা বলা যে, খোদা এক অদ্বিতীয়, খোদার কোনো পুত্র সন্তান নেই; তিনি নিজে জন্ম নেন নি এবং কাউকে জন্ম দেন নি। বাইবেল ও কুরআন শরীফের কোথাও একথা বলা নেই যে, ঈসা (আ.)-এর কর্তব্য হচ্ছে, খোদার পুত্র হওয়ার বিশ্বাসের খণ্ডন করা। এবং সেই সঙ্গে ক্রুশীয় মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করা অর্থাৎ ক্রুশভঙ্গ করা। প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের এই মিথ্যা আকিদাগুলো খণ্ডন করা যদি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে না পড়ে, খোদা যদি তাঁকে সেই দায়িত্ব না দিয়ে থাকেন (এবং খোদা তা দেনও নি) তাহলে, তাঁর (আ.) পুনরাগমনে কি লাভ? বরং কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তিনি বলবেন যে, এ সব মিথ্যা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

অতএব, ঈসা (আ.) মারা যাওয়ার পরেই, ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস প্রচারিত হয়েছে এবং এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের মাঝে প্রচলিত হওয়ার পরেই যখন এ পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে তখন ঐ সব বিভ্রান্তিকর খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসকে খণ্ডন করার এবং মিথ্যা প্রমাণিত করার দায়িত্ব তাঁর (সা.) ওপরই ন্যস্ত হয়েছিল। আর এই দায়িত্ব পালনে, তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছেন সারাটা জীবন। এ ব্যাপারে তিনি যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, অবশেষে পাদ্রী ও পণ্ডিতদের প্রতি মুবাহালা করার চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা না তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পেয়েছে, না সত্যকে গ্রহণ করেছে। খ্রিষ্টানদের সত্য প্রত্যাখানের এরূপ মনোভাব দেখে তিনি (সা.) এত বেশি মানসিক কষ্ট ও দুঃখ পেতেন যে, তাঁর কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। তাই স্বয়ং খোদা তা'লা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

'অতএব, তারা যদি এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর ওপর ঈমান না আনে, তাহলে কি তুমি তাদের জন্য নিজের আত্মাকেই ধ্বংস করে ফেলবে? *(সূরা আল কাহফ: ৭)*

কই, খোদা তো তখন এমন কথা বলেন নি যে, হে মুহাম্মদ, রসূল আমার! তুমি অযথাই এত মনোকষ্ট পাচ্ছ। ওরা তোমার কথা না মানলে, না মানুক। তুমি ধৈর্য্য ধরো। ঈসাকে যখন আমি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাব, তখন সে-ই তাদের কাছে তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

আপনি হয়ত বলবেন যে, হাদীসে যে আছে- প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ক্রুশভঙ্গকারী হবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি ক্রুশভঙ্গকারী হবেন। কিন্তু ক্রুশভঙ্গকারী এই মসীহ্ (আ.) তো উম্মতে মুহাম্মদীয়ারই এক ব্যক্তি। তিনি তো পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলী মসীহ্ (আ.) নন, বরং তিনি তাঁর মসীল বা সদৃশ বা অনুরূপ হবেন।

অর্থাৎ তিনি মসীলে মসীহ্ এবং পবিত্র কুরআনেও একথাই বলা আছে:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

"এবং যখন মসীল হিসেবে মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তখন দেখো! তোমার জাতি তখন এতে হৈ চৈ শুরু করে দেয়।" (সূরা যুখরুফ: ৫৮)

এবং ঠিক সেই হৈ চৈ-ই শুরু হয়ে গেছে সারা মুসলিম জাহানে, যখন বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত সেই মসীলে মসীহ্-এর আগমন হয়েছে। এখনও কি একথা বলার প্রয়োজন আছে যে, উম্মতের এই হৈ চৈ করাটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যিনি সদৃশ হিসাবে এসেছেন তিনি সত্য, তাঁর দাবি সত্য?

খাতামান্নাবীঈন

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٤١

(মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়্যিন আলীমা।)

অনুবাদ: মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী। *(সূরা আহযাব: ৪১)*

আরবী 'খাতাম' শব্দের সব অর্থে আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি। খাতামান্নাবীঈনের অর্থসমূহ হলো: (১) মোহর (২) আংটি (৩) পরিবেষ্টনকারী (৪) সর্বশ্রেষ্ঠ (৫) শেষ *(ইসলামী বিশ্বকোষ ও খতমে নবুওয়ত পুস্তক দ্র.)*

যখন "খাতাম" শব্দ বহুবচনের প্রতি আরোপিত হয় তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়। যেমন, হাদীসে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে খাতামুল মুহাজেরিন ও হযরত আলী (রা.)-কে খাতামুল আউলিয়া বলা হয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.)-এর পর মুহাজের এবং হযরত আলী (রা.)-এর পর কি কেউ ওলী হন নি? অবশ্যই হয়েছেন। খাতামুল মুহাজেরীন ও খাতামুল আওলিয়াতে যে অর্থে খাতাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে একই অর্থে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), যার কাছ থেকে ধর্মের অর্ধেক শিক্ষার কথা মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেছেন, তিনি (রা.) বলেন,

"তোমরা মহানবী (সা.)-কে 'খাতামুল আম্বিয়া' (নবীগণের 'খাতাম') বলো কিন্তু তাঁর পরে কোনো নবী নেই– একথা বলো না।" *(দুররে মানসূর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩)*

সূরা আন্ নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝٧٠

(ওয়ামাই ইউতিয়িইল্লাহা ওয়ার রসূলা ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিইয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দীকীনা ওয়াশ্শুহাদাই ওয়াস সালিহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকা)

অনুবাদঃ এবং যারা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের ও সালেহদের এবং এরা সঙ্গী হিসেবে অতি উত্তম। *(সূরা নিসাঃ ৭০)*

নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ এই চারটি আধ্যাত্মিক পুরস্কার "ওয়াও-এ আতিফা" (অব্যয়সূচক শব্দ) দিয়ে পরস্পর যুক্ত আছে। তাই এর যে-কোনো একটি পুরস্কার এ জগতে লাভ হলে অপর তিনটিও অবশ্যই এ জগতে লাভ হবে। আর এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এ উম্মতের অনেকেই সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ-এর পুরস্কার লাভ করেছেন। তাই নবুওয়তের যোগ্যতায় কেউ পৌঁছলে এবং যুগের চাহিদা থাকলে সে এ জগতেই এ পুরস্কার লাভ করবে। এতে আমার আপনার মনঃক্ষুণ্ন হবার বা রাগ করার কিছু নেই। এ জগতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পুরস্কারটি যদি পাওয়া যায় তবে প্রথমটিও পাওয়া যাবে। আর না পেলে কোনোটিই পাবে না। এখন ভেবে দেখার বিষয়, মুসলিম জাহানে এ পর্যন্ত কেউ সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ হয়েছেন কি? হয়ে থাকলে আনুগত্যকারী নবীও হবেন। কারণ একই ওয়াও-এ আতিফা দিয়ে চারটি পুরস্কারকে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর কোনো একটিকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আরবী ভাষার ব্যাকরণ এটাকে সমর্থন করে না। অতএব মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে উম্মতি হিসাবে নবীর আগমনের পথ খোলা আছে।

সূফিকুল শিরোমণি হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) বলেন, "রসূলে করীম (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে কেবলমাত্র শরীয়তবাহী নবুওয়ত শেষ হয়েছে, নবুওয়তের পদমর্যাদা নয়। তাই এমন কোনো শরীয়ত আসবে না যা মহানবী (সা.)-এর শরীয়তকে রহিত করতে পারে। আর এমন কোনো শরীয়তও আসবে না যা মহানবী (সা.)-এর শরীয়তের মাঝে নতুন কোনো বিষয় সংযুক্ত করবে। 'নবুওয়ত ও রিসালাত শেষ হয়ে গেছে' মূলত রসূলে করীম (সা.)-এর এই বক্তব্যের অর্থ এটাই। তাই 'আমার পরে কোনো রসূল ও নবী হবে না' রসূলে করীম (সা.)-এর এই বক্তব্যের অর্থ হলো, এখন আর এমন কোনো নবী হবে না যে আমার শরীয়তের বিরোধী হবে বরং যখনই কোনো নবী হবে সে আমার শরীয়তের অধীনস্থই হবে। *(ফতুহাতে মক্কীয়া, খন্ডঃ ২, পৃ.ঃ ৩)*

তিনি আরো বলেন, "শরীয়তবাহী নবুওয়ত ও রিসালাত রসূলে করীম (সা.)-এর মাঝে শেষ হয়েছে। তাই তাঁর (সা.) পর শরীয়তবাহী কোনো নবী আসবে না। ..... তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর বিশেষ দয়াপরবশ হয়ে শরীয়তবিহীন সাধারণ নবুওয়তের ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। *(ফুসুসুল হিকাম, পৃ.ঃ ১৩৪-১৩৫)*

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর দাবির সত্যতা

ইহুদিরা যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন করত তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) সত্যতার প্রমাণ হিসেবে এক আয়াতে বিশ্বাসীদের একটি উত্তর শিখিয়েছিলেন। আর এ উত্তরটি সূরা আল হাক্কার ৪৫-৪৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٥﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٦﴾
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٨﴾

আর সে যদি কোনো কথাকে মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করত তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তার জীবনশিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। *(সূরা আল হাক্কা: ৪৫-৪৮)*

আমরা যারা মুসলমান, আমরা জানি ও ঈমান রাখি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্যবাদী নবী ও রসূল ছিলেন। আমরা জানি, তিনি (সা.) ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবি করেন আর ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহানবী (সা.) তাঁর প্রথম ওহী লাভ করার পর ২৩ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। মুসলমান আলেমগণ যুগ যুগ ধরে এই মানবগুকে আহলে কিতাবদের সামনে মহানবী (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ্ তা'লা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের কেউ মিথ্যা দাবিদারকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ শারাহ্ আকায়েদ নাসফীতে লেখা আছে, নবী ছাড়া অন্য কারো মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার পরও আল্লাহ্ তাকে ২৩ বছর ছাড় দিবেন– এটিও একেবারে অসম্ভব' *(মাবহাসুন নবুওয়ত, পৃ. ১০০)*। এরপর তিনি মানদণ্ড হিসেবে ২৩ বছর কেন নিলেন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত শারাহ আকায়েদ নাসফীতে লিখেন, নিশ্চয় মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হয়েছেন তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর আর যখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৪) তাই চলুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত এই মানবকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে যাচাই করে দেখি। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮০ সালের পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শরীয়তবিহীন ওহী ও ইলহামপ্রাপ্তির দাবি করেন। আর এ দাবি তিনি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে প্রকাশ করে দেন। আর সফল জীবন কাটিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৯০৮ সনে। অর্থাৎ মির্যা সাহেব ইলহাম প্রাপ্তির দাবি করার পর ২৮ বছরেরও বেশি জীবন লাভ করেছেন। অতএব পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবিতে সত্য প্রমাণিত হন। অনেকে খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়ে বলে ফেলেন, এমন তো অনেকেই করতে পারে এবং ২৩ বছর জীবন লাভ করতে পারে। যারা এমন কথা বলেন

তাদেরকে বলছি, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। আমাদের আল্লাহ্ এখনও তেমনই ক্ষমতার অধিকারী যেমনটি তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় ছিলেন। এমন বক্তব্য খোদার বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ শুনুন! পৃথিবীতে এমন কোনো মিথ্যা দাবিদার দেখাতে পারবেন কি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা ওহী ও ইলহাম আরোপ করে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে। নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার অনেকেই গত হয়েছে, যে-কোনো একটি উদাহরণ উপস্থাপন করুন যেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী ও ইলহাম লাভের মিথ্যা দাবি প্রচার করেও কেউ ২৩ বছর জীবন পেয়েছে। অসম্ভব, কখনো এমনটি হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপকারীকে আল্লাহ্ নিজে ধ্বংস করে দেন। অতএব হৃদয়ের চোখ উন্মুক্ত করে দেখুন এই আয়াত কীভাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর স্বপক্ষে তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে আমরা আরেকটি সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করছি। এটি এমন একটি প্রমাণ যা কোনো মানুষ চাইলেই উপস্থাপন করতে পারে না অর্থাৎ এতে মানবীয় শক্তির কোনো হাত থাকে না। এই সত্যতার প্রমাণ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা হলো,

إِنَّ لِمَهْدِيِنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِى النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

"নিশ্চয় আমার মাহদীর জন্য এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারো সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমজানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্য প্রদর্শিত হয় নি।" *(দারকুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব সালাতুল কুসুফ ওয়াল খুসুফ)*

আল্লাহ্ তা'লার অপার মহিমায় এ দু'টি লক্ষণই ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে আর হাদীসে উল্লিখিত একই রমজানের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণও সংঘটিত হয়েছে। তখন একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবিদার ছিলেন। একথা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ছাড়াও এদেশের প্রখ্যাত সুরেশ্বরের পীর সৈয়দ আহমদ আলী তাঁর ১৯১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 'মদিনা কলকি অবতারের ছফিনা' এবং 'ছফিনায়ে ছফর' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। অতএব তাঁর (আ.) সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এই অকাট্য নিদর্শন ও সত্যতার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণির আলেম উলামার দৃষ্টিতে সত্যতার কোনো প্রমাণ চোখে পড়ে না। তবে এটি নতুন

কথা নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও যখন এসেছিলেন তখন আবু জাহলও সে সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার কোনো প্রমাণ তার চোখে ধরা পড়ে নি। এত বড় মাপের নবী সামনে থাকতেও তাঁকে সনাক্ত করার যোগ্যতা আবু জাহলের ছিল না। তাই সত্য অন্তঃকরণের মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার এমন অকাট্য নিদর্শন ও প্রমাণ অনুধাবন করতে পারে যা তাদের ঈমান লাভের কারণ হয়।

ইতিহাস

* মহানবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
* মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম এবং পরিচয়
* মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
* আহমদীয়া খলীফাগণের নাম এবং পরিচয়

মহানবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র নাম: মুহাম্মদ (সা.), কুনিয়াত: 'আবুল কাসেম' (কাসেমের পিতা) এবং লকব: 'আল আমীন' (বিশ্বস্ত) এবং 'আস্ সুদুক' (অধিক সত্যবাদী)। ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের সোমবার বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৯৩) মতান্তরে ১২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর (সা.) দাদার নাম হযরত আব্দুল মুত্তালিব, পিতার নাম হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং মাতার নাম হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহ্হাব। তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ জন্মের ছয় মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন এবং মাতা তাঁর জন্মের পর ছয় বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর দুধ মাতার নাম হযরত হালিমা সা'দিয়া বিন্তে আবু যুরাইব (রা.)। তিনি হাওয়াজিন বংশের বনী সা'দ গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন পিতামহ হযরত আব্দুল মুত্তালিব। পরে তিনিও মারা গেলে শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন তাঁর চাচা হযরত আবু তালিব। মহানবী (সা.) পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর সাথে। তখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। হযরত খাদিজা (রা.)-এর লকব বা উপাধি ছিল 'তাহেরা'। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি শেষ ঐশী কিতাব "আল কুরআন" অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয় দান করেন এবং বিলুপ্ত একত্ববাদকে মহানবী (সা.) পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মহানবী (সা.) ২৬ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১১ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল ৬৩ বছর বয়সে মদিনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাসগৃহেই সমাহিত করা হয়। *(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২-৫৫৩ এবং দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান, পৃ. ১৬)*

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম এবং পরিচয়

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থ: তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্য অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, এরাই হবে দুষ্কৃতকারী। *(সূরা নূর: ৫৬)*

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর তিরোধানের পর যে চারজন সাহাবী মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং তাঁর (সা.) কাজকে অব্যাহত রাখতে কাজ করেছিলেন তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে পরিচিত। তাঁদের উপাধি ছিল আমীরুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের নেতা।

খোলাফায়ে রাশেদীন রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিমগণের খিলাফতকাল:

১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) : ১১ হিজরী-১৩ হিজরী (৬৩২-৬৩৪ ইং)
২) হযরত উমর ফারুক (রা.) : ১৩ হিজরী-২৪ হিজরী (৬৩৪-৬৪৪ ইং)
৩) হযরত উসমান গনী (রা.) : ২৪ হিজরী-৩৫ হিজরী (৬৪৪-৬৫৬ ইং)
৪) হযরত আলী মুর্তজা (রা.) : ৩৫ হিজরী-৪০ হিজরী (৬৫৬-৬৬১ ইং)

মধ্যকালীন বিরতি দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর বাণী:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। *(মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)*

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১২৫০ হিজরীর ১৪ শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার 'কাদিয়ান' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব (তিনি কাদিয়ানের সর্দার ছিলেন); মাতার নাম হযরত চেরাগ বিবি সাহেবা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সর্বপ্রথম মুন্সী ফযলে ইলাহী সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মৌলভী ফযল আহমদ সাহেবের কাছে কিছু আরবী ব্যাকরণ এবং মৌলভী গুল আলী শাহ সাহেবের কাছে আরবী ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া পিতার কাছে তিনি হেকিমী শাস্ত্রের ওপর কিছু বই নিয়েও পড়াশুনা করেন। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন নি। ১৮৬৪ সালে শিয়ালকোটে সেরেস্তাদারের চাকুরী করেছিলেন যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর অধীনে ব্যবসা করেছিলেন। তিনি ২০ রজব, ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্থ গৃহে প্রথম বয়আত নেয়া শুরু করেন। সেদিন ৪০ জন হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁদের মাঝে সর্বপ্রথম বয়আত করেন হযরত হেকিম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরো যারা বয়আত করেছেন তারা হলেন, হযরত হাফেয হামিদ আলী সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারি সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি আরোঢ়া খান সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) ও হযরত মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৬ মে ১৯০৮ সনে লাহোরে ইন্তেকাল করেন এবং ২৭ মে ১৯০৮ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

খিলাফত

ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে যে, খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে কী বলেছেন।

কুরআন মজীদের সূরা নূর-এ আল্লাহ্ বলেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

(ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস্ সালিহাতে লাইয়াস্তাখলিফান্নাহুম ফিল আরযি কামাস্ তাখলাফাল্লাযিনা মিন্ ক্বাবলিহিম।) *(সূরা নূর: ৫৬)*

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনবে, এবং সৎকার্যসমূহ সম্পাদন করবে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খিলাফত দান করেছিলেন।

এ খিলাফত কী? খলীফা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কী ধারণা?

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে, সমাজে, গ্রাম এলাকায় এর অবস্থান কী আসুন তা তলিয়ে দেখি। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কুরআন মজীদের খিলাফত সম্পর্কিত উপরোক্ত আয়াতটির অর্থ খুঁজতে ক'টি অনুবাদ পাঠে এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে উদাসীনতা পরিদৃষ্ট হয়। ঢাকার বিখ্যাত এমদাদিয়া লাইব্রেরি নূরানী কুরআন শরীফ নামে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মূল থেকে মাওলানা নূরুর রহমান সাহেব যে বাংলা অনুবাদ করেছেন, তাতে খিলাফত শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'আধিপত্য দান'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড: মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব (খোশরোজ কিতাব মহলো থেকে প্রকাশিত) একই শব্দের অর্থ করেছেন, 'রাজত্ব দান'। মৌলানা ফজলুর রহমান ও মৌলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবরা করেছেন 'শাসন কর্তৃত্ব দান'। আর আরবী ডিকশনারী ও অধিকাংশ মুফাসসের-এর মতকে গ্রহণ করে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত এ শব্দটির অর্থ করেছে-'খলীফা নিযুক্ত' বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। আমার ধারণা-এ খিলাফত বা খলীফার অর্থ নিয়ে বিপত্তি বলে আজ অধিকাংশ আলেমগণ বা মুসলমানগণ এর প্রয়োগ, অবস্থান ও কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন। এ যে ইসলামের জন্য নেয়ামত বা সঞ্জীবনী সুধা তা' সত্যিকারভাবে অনুধাবন করতে পারছে না বলেই হয়তবা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে যারা জামা-কাপড় সেলাই করে তাদেরকে দর্জি বা খলীফা বলা হয়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে যারা নৌকার ছই বা থাকার ঘর বানায়, তাদেরকেও ছইয়াল বা খলীফা বলে। বিষয়টাকে এতই ফেলনা মনে করা হয় যে, কোনো কোনো অঞ্চলে যারা খতনা করার কাজ করে, তাদেরকেও হাযাম বা খলীফা বলা হয়।

আবার আমাদের বাংলাদেশে বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর পীর সাহেবদের প্রতিনিধিকেও খলীফা বলা হয়। পীর সাহেব হন খলীফার নিয়োগদাতা। তিনি তার জীবদ্দশাতেই এ নিয়োগদান

করেন। অবচেতন আত্মা এ নেয়ামতের প্রয়োজন অনুভব করে বলেই হয়ত এমনটি করা হয়। দুনিয়ার কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক দল গঠন করেও ইসলামে এর অত্যাবশ্যকীয়তা প্রকাশ করা হয়। নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার ও অর্থ সম্পদের লোভ-লালসা আজ মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত খুঁজে পাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর এ জন্যই পৃথিবীতে আজ মুসলমানরা অন্য ধর্মের মানুষের কাছে মারও খাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা যে খিলাফত বা খলীফার কথা বলব, তার অর্থ কারো পিছন পিছন আসা বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর এর নিয়োগদাতা আল্লাহ্-আর তিনি (আল্লাহ্) মু'মিনদের সাথে এ ওয়াদা করেছেন।

নবী আসেন মানুষকে ঈমানদার, খোদার হুকুম পালনকারী বান্দা বানানোর জন্য। নবী যেসব কাজ মানুষের কল্যাণের জন্য করেন, তারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন খলীফা। এজন্য নবীর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফা বানানো আল্লাহ্র কাজ। মানুষ খলীফা বানালে, সে মানুষেরা আল্লাহ্র সাহায্য কীভাবে পাবে? আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, নবী রাসূলগণের আধ্যাত্মিক সত্তা বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ যেন পৃথিবীর ঈমানদার মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকে। তাই খলীফা বা খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মু'মিনের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। মু'মিনদের জন্যে নবুওয়তের পর যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য তা' হচ্ছে খিলাফত।

নবুওয়তের দায়িত্ব যেমন হাঈয়ুন ও কাঈয়ুম, ওয়াহেদ ও লা-শরীক খোদার প্রকাশ্য অস্তিত্ব উপস্থাপন করা, মানব হৃদয় ও মানব বুদ্ধির আকাশে ঐশী আলোর বন্যা প্রবাহিত করা; মানুষের মন ও মেধা, বোধ ও বুদ্ধির পবিত্রতা-পরিপক্কতা সাধন করা এবং মানুষকে আল্লাহ্-মিলনের সরল পথে স্থায়ীভাবে পরিচালিত করা। খিলাফতের দায়িত্বও ঠিক তাই। নবুওয়তের মাধ্যমে যেভাবে খোদা তা'লার শক্তি ও মহিমার প্রকাশ ঘটে, খিলাফতের মাধ্যমেও তেমনই খোদা তা'লার শক্তি ও মহিমার পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, "খোদা তা'লা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন। প্রথমে নবীগণের মাধ্যমে তাঁর কুদরতের এক হস্ত প্রদর্শন করেন, আবার যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাপদ উপস্থিত হয় এবং শত্রুরা শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে যে, এই (নবীর) কার্য ব্যর্থ হয়ে গেছে।... তখন খোদা তা'লা পুনরায় তাঁর মহাশক্তির প্রকাশ ঘটান এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। অতএব, যাঁরা ধৈর্য ধারণ করে তাঁরাই খোদা তা'লার সেই মোজেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমনটি মানুষ করেছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়ে।

আসুন! এখন দেখি খলীফা কিভাবে নির্বাচিত হন?

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বার বার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজেই তাঁর খলীফা নির্বাচন করেন। যেমন তিনি বলেন, 'ইন্নি জাইলুন ফীল আরযে খলীফা' (সূরা বাকারা: ৩১) নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। সূরা নূর এর ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি খলীফা মনোনীত করবেন

বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন যেমনটি তিনি পূর্ববর্তীদের মাঝে করে আসছেন। এতে এটা স্পষ্ট যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এ ওয়াদা সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে দেয়া হয়েছে। তাই, এটা অতীত উম্মতের জন্য নয় বরং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সাধারণত খিলাফত বা খলীফা দুইভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। প্রথমত: খলীফাতুল্লাহ। খলীফাতুল্লাহ্ অর্থাৎ নবী সরাসরি ওহীর মাধ্যমে নির্বাচিত বা মনোনীত হন। এ অর্থে সকল নবী রসূলগণই আল্লাহ্‌র খলীফা বা খলীফাতুল্লাহ্। দ্বিতীয়ত: খলীফাতুল্লাহ্ অর্থাৎ নবীর ইন্তেকালের পরে তাঁর অনুগত জামা'তের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা একজনকে খলীফা হিসাবে নির্বাচন করেন। ইনি খলীফাতুর রসূল হন।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের ধর্ম শুরু হয়েছে নবুওয়তের মাধ্যমে। আল্লাহ্ যতদিন চান, তা' কায়েম থাকবে, তারপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ খিলাফত উঠে যাবে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ রাজতন্ত্রও নানাভাবে চলার পর তা-ও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুনরায় 'খিলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়ত' অর্থাৎ নবুওয়ত পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ধারার খিলাফতের সময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যে খিলাফতে রাশেদার কথা আমরা জানি তার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ত্রিশ বা বত্রিশ বছর এবং এভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.) সকল খলীফার মাঝে সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে তার প্রশংসার কথা উল্লেখ আছে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যে, মুসলিম জাহানের মাঝে কোনো শৃঙ্খলা বা একতা বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু অল্পকাল পরেই দেখা গেল শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে এবং সমস্ত মুসলিম জাহান একতাবদ্ধ হয়েছে। আর পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগই শ্রেষ্ঠ যুগ ছিল।

যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তদনুযায়ী খোদার প্রতিশ্রুতি ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.) এ যুগে, এ উম্মতে আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহেস সালামের ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনের ২৭শে মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'খিলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়ত'।

এ খিলাফতের অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা হলেন হযরত হাফেয মৌলানা হাজীউল হারামাইন শরীফাইন হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) আর সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান ও পঞ্চম খলীফা হচ্ছেন আমীরুল মু'মিনীন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আই.)।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, 'আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমাকেও খোদা খলীফা বানিয়েছেন, যেমন তিনি আদম (আ.) এবং আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) কে খলীফা বানিয়েছেন।' *(বদর, ৪ জুলাই ১৯১২ ইং)*

তিনি আরো বলেন, 'আমাকে যদি কেউ খলীফা বানিয়ে থাকে, তবে খোদা তা'লা বানিয়েছেন এবং নিজ প্রজ্ঞার মাধ্যমে বানিয়েছেন। খোদার মনোনীত খলীফাকে কেউ পদচ্যুত করতে পারে না।... ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক, যে বলে আমরা খলীফা বানিয়েছি।' *(আল হাকাম, ২১ জানুয়ারী ১৯১৪ ইং, আল ফযল লন্ডন, ২১ জানুয়ারি ২০০০ইং)*

এ পর্যায়ে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। খিলাফত মূলত এরূপ তৌহীদের প্রতিফলন বা বিকাশ যে, আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে একজন ইমামের হাতে একত্রিত করে রাখতে চান বা দেখতে চান। তাই তিনি নবী প্রেরণ করেন। নবীর পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক পৃথক করে হেদায়েত, রহমত, বরকত নাযেল করা তৌহীদের বিপরীত। আল্লাহ্ অতি মহান। তিনি মানুষকে একা একা জীবন যাপনের সুযোগ দেন নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তের মাধ্যমে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে লিখেছেন:

"অতএব, হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তা'লার বিধান এই যে, তিনি দুটি কুদরত বা শক্তি প্রদর্শন করেন। যেন বিরোধীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থ করে দেন। অতএব এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, তিনি তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত (অর্থাৎ খিলাফত) আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। আমি যখন চলে যাব তখন খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত (খিলাফত) প্রদান করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।" *(আল ওসীয়্যত; অনুবাদ– সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সংস্করণ, পৃ. ১৫)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন: "খিলাফতের প্রতিশ্রুতি শর্তসাপেক্ষ, এ পুরস্কার কেবল তারাই পেতে পারে যারা রাতদিন সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার মাঝে অতিবাহিত করে। সুতরাং প্রত্যেক আহ্মদীর কর্তব্য নিজ জীবনকে সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার মাঝে পরিবেষ্টিত রাখা, যেন খিলাফত পুরোদমে পুরোশক্তির সাথে বিস্তৃতি ও প্রসারতা লাভ করে, এমন গাছের মতো দৃঢ় হয়ে যায়, যার শাখা প্রশাখা আকাশে পৌঁছে যায় এবং শিকড় মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে।" *(খুতবা জুমুআ ১১ই জুন ১৯৮২ ইং, আলফযল ২২ জুন ১৯৮২ ইং পুনরায় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ইং)*

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে এ অনন্য ও ঐতিহাসিক খিলাফতের নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

(ক) **নেযামে ওসীয়্যত:** হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা নিজেদের উপার্জনের ১/৩ ভাগ থেকে শুরু করে কমপক্ষে ১/১০ ভাগ হারে নিয়মিত চাঁদা দেবেন এবং স্বেচ্ছায় নিজ নিজ সম্পত্তিরও অংশও উক্ত হিসাবে প্রদান করবেন।

এ বিপুল অর্থে বিশ্বের দারিদ্রপীড়িত মানুষগুলোর জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সংবলিত এক নতুন আদর্শ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি হবে খলীফার নেতৃত্বাধীন সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিক্ষুকবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কোনো অভাবী বৃদ্ধ, বিধবা অনাহারে থাকবে না। এ কার্যক্রম তৌহীদ ও ইসলাম প্রচারের অতিরিক্ত ও আনুষঙ্গিক হবে।

এ ব্যবস্থাটির অধীনে এযাবৎ বহু আহ্মদী তাদের ধনসম্পদ দান করে এ ব্যবস্থাকে অগ্রগামী করেছেন। বর্তমান খলীফার ইচ্ছা হলো চলমান খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আহ্মদীয়া জামা'তের উপার্জনশীল অর্ধেক সদস্যই এ ব্যবস্থার অধীনে চলে আসবেন।

(খ) **নেযামে বায়তুল মাল:** এ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক আহ্মদী মুসলমান (যারা হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বা তাঁর খলীফার হাতে বয়আত করেছেন) স্বেচ্ছায় নিজ উপার্জনের ১/১৬ ভাগ হারে চাঁদা দেবেন। এতে কুরআন মজীদে বর্ণিত 'ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফেকুন' অর্থাৎ রিযক থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় দান-নির্দেশের বাস্তবায়ন হবে। এ অর্থে সারা বিশ্বে তৌহীদ ও সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হবে। জামা'তী ব্যবস্থাপনার সকল ব্যয় এ অর্থে নির্বাহ হবে। বর্তমানে আহ্মদীয়া জামা'তে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(গ) **কাযাবোর্ড:** পৃথিবীর যে সব দেশে এ পর্যন্ত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে সব দেশে জামা'তে আহ্মদীয়ার সদস্যদের বিবিধ অভিযোগ ও বিরোধ মীমাংসার জন্য রয়েছে কাযা বোর্ড। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রীয় আইনে মামলা দায়ের করার প্রয়োজন খুব কম হয়। যে সব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে জামা'ত আইন-আদালতে যাবার অনুমোদন দেয়। তবে কোনো বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়ালে তাতে জামা'ত হস্তক্ষেপ করে না।

(ঘ) অঙ্গসংগঠনসমূহ: চল্লিশোর্ধ প্রবীণদের জন্য রয়েছে মজলিসে আনসারুল্লাহ্। পনেরো থেকে চল্লিশ পর্যন্ত তরুণদের রয়েছে মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া। ছেলে শিশু থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত শিশু কিশোরদের জন্য আতফালুল আহ্মদীয়া। নারীদের জন্য রয়েছে লাজনা ইমাইল্লাহ্। মেয়ে শিশু ও কিশোরীদের জন্য নাসেরাতুল আহ্মদীয়া। প্রত্যেকটি সংগঠন যুগ খলীফার নির্দেশনায় নিজ নিজ গণ্ডিতে ধর্মীয় শিক্ষাসহ তরবিয়তের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ইসলাম প্রচার ও মানবজীবনের সকল চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ ও ওয়াকফে নও স্কীম। তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান যুগে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে

MTA International নামে নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল চালু ছাড়াও Internet-এর মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে তৌহীদ ও রিসালতের কার্যাবলী। গত ২৩ মার্চ, ২০০৭ থেকে আরব বিশ্বের মানুষগুলোর জন্য mta-এর পৃথক চ্যানেল mta-3 চালু হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, "আহ্‌মদীয়া জামা'ত যদি খিলাফতের ওপর ঈমান রাখে এবং এর জন্য সঠিক অর্থে সংগ্রাম করতে থাকে তাহলে এ ব্যবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। শয়তান কখনোই এর মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।" *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১০ জুন ২০০৫ ইং)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেন, "আমি আপনাদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, এরপর আহ্‌মদীয়া খিলাফত কখনো ভয়ংকর বিপদে পড়বে না ইনশাআল্লাহ্। আহমদীয়া জামা'ত এখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সাবালক (বালেগ) হয়েছে। শত্রুর কোনো দৃষ্টি; শত্রুর কোনো অন্তর, শত্রুর কোনো চেষ্টা এ জামা'তের কেশও বাঁকা করতে পারবে না। আহ্‌মদীয়া খিলাফত ইনশাআল্লাহ্ ঐ সমস্ত শান-শওকত মান-মর্যাদা নিয়েই বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে। যে শান-শওকতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত এ জামা'ত জীবিত থাকবে। সুতরাং দোয়া করতে থাকুন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসার গীত গাইতে থাকুন আর নিজেদের (বয়আতের) প্রতিজ্ঞার নবায়ন করুন"। *(আল ফযল; ২৮ জুন, ১৯৮২ ইং, লন্ডন আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল; ১৩ জুন ২০০৩ ইং)*

হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) তাঁর প্রথম জুমুআর খুতবায় (২৫ এপ্রিল ২০০৩ ইং) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে শোনান যে, "আমি বড়ই দাবি ও দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার পদতলে সমর্পিত দেখতে পেয়েছি। আর নিকট ভবিষ্যতে আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছে...।"

আমাদের আহ্‌মদীয়া খিলাফতের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা অতি উত্তম। যে কেউ হুযূর (আই.)-এর সমীপে শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ পত্র লিখতে পারে। গোড়া থেকেই ছোট বড়, মহিলা, পুরুষ সবাই হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে নিজ পিতার স্থলে স্থান দিয়ে সব যুগে সব কালে পত্র লিখে মনের কথা বলে থাকেন। যুগ খলীফা তাদের পত্রের উত্তরে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে সাড়া দেন। হুযূরের হৃদয় নিংড়ানো দোয়ার বরকতে তারা কল্যাণমণ্ডিত হয়। খলীফার সাথে রয়েছেন মুত্তাকী আলেম বা'আমল এমনসব আলেম যারা উঁচু স্তরের মুত্তাকী; খোদাভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মশীল। তারা খলীফার সাহায্যের জন্য সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকেন। খলীফা তাদের সাথে পরামর্শ করেন। অসাধারণ কল্যাণবহ খিলাফতের এ ধারাকে আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকব, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ইমাম মাহদী (আ.) ও আহমদীয়া খলীফাগণের নাম এবং পরিচয়

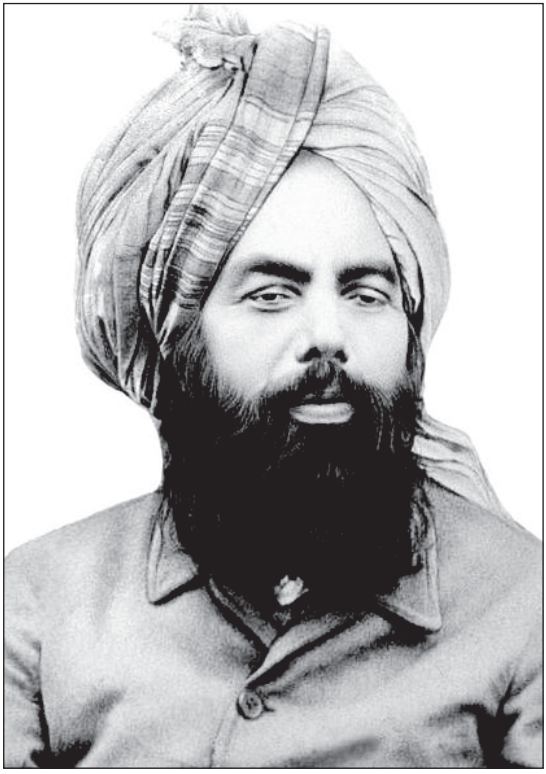

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (হি. ১২৫০-১৩২৬ খ্রি. ১৮৩৫-১৯০৮)

হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (১৯০৮-১৯১৪)

হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ সানী (১৯১৪-১৯৬৫)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ সালেস (১৯৬৫-১৯৮২)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ রাবে (১৯৮২-২০০৩)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (২০০৩ -)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) কেন পৃথিবীতে আগমন করেছেন?

মহানবী (সা.)-এর উচ্চমর্যাদা, কুরআনের সত্যতা ও ইসলামের সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইমাম মাহদী (আ.)-এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

এ বিষয়টি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষাতেই শুনে নেয়া যাক। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, আমি মহানবী (সা.)-এর হারানো সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্ববাসীকে দেখানোর নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছি। আর এসব কাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এগুলো দেখতে পায় না। অথচ এখন এ জামা'ত সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে আর এ জামা'তের নিদর্শন ও সত্যতার এত লোক সাক্ষী আছে যে, তাদেরকে যদি একত্র করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা পৃথিবীর বুকে যে-কোনো বাদশাহ্‌র তুলনায়ও বেশি হবে।

তিনি (আ.) বলেন, জামা'তের সত্যতার এমন এমন নিদর্শন রয়েছে, যার সবগুলো বর্ণনা করাও সহজসাধ্য বিষয় নয়। যেহেতু ইসলামের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও অবমাননা করা হয়েছিল, এর ফলেই আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তর হিসেবে এই জামা'তকে মর্যাদা ও সম্মান দেখিয়েছেন।

এই অন্ধকার যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রচারের কাজ পুনরায় চালু করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমানরা ইসলামের সুরক্ষা ও সেবার কাজে একেবারে উদাসীন ছিল। নিজের আশেপাশের লোকদের কখনো কখনো তবলীগ করলেও তবলীগকে দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি মুসলমানদের মাথায়ই আসে নি। আর খ্রিষ্টান-প্রধান দেশগুলোতে ইসলাম প্রচারের চিন্তাও করা হতো না। তিনি (আ.) ১৮৭০ সনে প্রথম এদিকে দৃষ্টি দেন এবং সর্বপ্রথম চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং এরপর একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউরোপের লোকদেরকে ইসলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসলাম নিজ সৌন্দর্যে অপরাপর সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি কোনো ধর্মের সাহস বা যোগ্যতা থাকে তাহলে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখতে পারে। মি. আলেকজেন্ডার ওয়েব বিখ্যাত আমেরিকান মুসলিম মিশনারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা পড়েই মুসলমান হয়েছিলেন এবং তিনি কেবল মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যই ভারতে এসেছিলেন। ঠিক তখন অন্যান্য মুসলমান তাকে ভুল বুঝিয়ে বলে যে, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে অন্য মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হবে এবং আপনার কাজে তারা সহায়তা করবে না। কিন্তু তিনি আমেরিকা ফিরে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং আমৃত্যু তিনি তার এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হবার বিষয়টি বিভিন্ন চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আর আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের তবলীগের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন জারি আছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো বিশ্বে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে কেবলমাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

এটি কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশারই কথা নয় বরং তিনি তাঁর রচনাবলীতে, তাঁর পুস্তকাদিতে, তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে যে আলোকপাত করে

গেছেন এগুলো আজও মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে শত্রুদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করছে।

মুসলমানদের মাঝেও পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন আয়াতকে মনসুখ বা রহিত আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সবকিছুর বিপরীতে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াতও মনসুখ বা রহিত নয়। প্রত্যেকটি আয়াত প্রতিটি শব্দ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর এবং জীবন্ত আর যে-সব আয়াত নিয়ে বিভিন্ন ফিরকা বিপাকের মাঝে ছিল সেগুলোর সঠিক ও গূঢ় তত্ত্বসংবলিত ব্যাখ্যা তিনি (আ.) জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং সকল আপত্তিকারীর যৌক্তিক ও দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অমুসলিমদের সামনে যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনীর সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় তারা তখন বলতে বাধ্য হয় যে, যদি তাঁর (সা.) সীরাত এমনই হয়ে থাকে, তাঁর শিক্ষা যদি এমনই হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে আমরা ভ্রান্তির মাঝে ছিলাম আর এ সত্যকে মানতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। অসংখ্য উদাহরণের মাঝে একটি হলো, ডেনমার্কের এক ইসলাম বিদ্বেষী তাদের ড্যানিশ পত্রিকায় তার এক প্রবন্ধে কার্টুন প্রকাশ করেছিল। সে যখন হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য শুনেছে এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছে তখন সে তাদের পত্রিকায় লিখতে বাধ্য হয়েছে যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা শুনে আমি প্রকৃত সত্য জেনে গেছি এবং পাশাপাশি সে তার ভুলও স্বীকার করেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যা কিছু বলে গেছেন এবং যেসব তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন এ সবকিছুর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত করেছিলেন যেন তিনি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করেন এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও মাহাত্ম্য এবং এর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "এই রোগাক্রান্ত যুগে কুরআন শরীফের মাহাত্ম্য আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আর খোদাপ্রদত্ত আত্মিক জ্যোতি, অনুগ্রহরাজি, ঐশী নিদর্শন এবং খোদাপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ধর্মের ওপর আক্রমণকারী সকল শত্রুকে প্রতিহত করাও আমার কাজ।" *(বারাকাতুদ্ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড)*

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল তা বাস্তবায়িত হতে দেখছি। সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামা'ত সর্বস্তরে মহানবী (সা.), পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। অতএব এক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে কোনোরূপ হীনমন্যতা রাখা উচিত নয় বরং পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী এই মহাপুরুষের সাহায্যকারী হয়ে নিজেদেরও মুহাম্মদ (সা.), ইসলাম এবং কুরআনের বিশ্ব বিজয়াভিযানে অংশ নেয়া আবশ্যক।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করা জরুরি কেন?

পূর্ব বর্ণিত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর খিলাফতকে অবশ্যই মান্য করতে হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হলো:

(ক) হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

"যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র খলীফা আল-মাহ্দী।" *(সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্দী)*

(খ) হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

ثُمَّ يَجِيءُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ المَهدِيُّ فَإِذَا سَمِعتُم بِهِ فَأْتُوهُ فَبَايِعُوهُ ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ المَهدِيُّ

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার খলীফা ইমাম মাহদী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমনবার্তা শুনা মাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে।" *(মিসবাহ্ যুজাজা, হাশিয়া ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী)*

উপরোক্ত হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর নিকট বয়আত করা হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী অবশ্য কর্তব্য বা ফরয।

(গ) এতদ্ব্যতীত, তিনি তাঁর উম্মতকে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর উপর ঈমান আনতে এবং তার নিকট সালাম পৌঁছাতে বলেছেন:

وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ ,فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে।" *(কনযুল উম্মাল)*

যেহেতু হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে, কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বমানবের মাঝে প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও সম্প্রসারণের বিরাট দ্বায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্যান্য ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবেন সেহেতু, রসূলে মকবুল (সা.), ইমাম মাহ্দী (আ.) কে সাহায্য করা ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব (অবশ্যকর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন:

وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ

"প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদীর সাহায্য করা অথবা বলেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া।" *(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহ্দী)*

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে না মানার পরিণাম

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

(ক) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) মৃত্যুবরণ করবে।" *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)*

(খ) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে।" *(সহীহ্ মুসলিম)*

(গ) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

"যে ব্যক্তি আমার এতায়াত (আনুগত্য স্বীকার) করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তা'লার এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের এতায়াত করে, নিশ্চয় সে আমার এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আমার অবাধ্যতা করে।" *(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত)*

(ঘ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার উম্মতের ওপরও সেসকল অবস্থা আসবে যেরূপ বনী ইসরাঈলের ওপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমনকি তাদের মধ্য হতে যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রূপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে এরূপই করবে। বনী ইসরাঈল তো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে

যাবে কেবলমাত্র এক ফিরকা ব্যতীত।' তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই ফিরকা কোনোটি?" তিনি বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকা থাকবে।" *(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)*

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী সূর্য হতেও উজ্জ্বল এবং সত্য, কোনো মু'মিন তাঁর (সা.) বাণীকে অবহেলা করে এড়িয়ে যেতে পারে না। বলা বাহুল্য, হুযূর আকদাস (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী এ উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফিরকা হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফিরকাকে সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা বিশ্বাস করে গর্ব ও আনন্দ বোধ করে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

"কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ডবিখণ্ড করে নিয়েছে। (এবং বিভিন্ন দলেউপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।) প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দিত। সুতরাং তুমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ছেড়ে দাও।" *(সূরা মুমিনূন: ৫৪-৫৫)*

প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র একটি ফিরকাই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। এ বিষয়ের মীমাংসা স্বয়ং নবী করীম (সা.) করে দিয়েছেন এবং এ সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকাকে চিনবার জন্য এই মাপকাঠিও উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন- যে ফিরকা নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণের পথে পরিচালিত হবে এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে কেবল সেই ফিরকাই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। সাহাবাদের পথ ও কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত এ ছিল যে, যতদিন নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে সর্বান্তঃকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে গিয়েছেন এবং হুযূর আকদাস (সা.)-এর ইন্তেকালের পরক্ষণেই তাদের মধ্যে-

১। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সাহাবাগণ একতা-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক মহব্বতের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং খলীফার নেতৃত্বাধীনে তাঁরা পারস্য, সিরিয়া, ইরাক ও মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করে ইসলামী পতাকার ছায়াতলে এনে এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

২। তাদের একটি কেন্দ্র ছিল।

৩। তাদের বায়তুল মাল ছিল।

৪। খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) ছিল।

৫। তাদের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এবং একে অপরের জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তর বস্তু এমনকি জীবন পর্যন্ত কুরবান করতেন।

৬। তারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন।

বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামা'তে আহ্‌মদীয়া ছাড়া কোনো ফিরকার মধ্যে সাহাবাদের এই গুণাবলীর সমাবেশ আছে বলে কেউ দাবি করতে পারে না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্য এস্থলে চিন্তার খোরাক রয়েছে।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য না করলে, আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আদেশ অমান্য করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে এবং সত্য ফিরকা অবলম্বন না করলে আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করতে হবে।

নেযামে জামা'ত (জামা'তের ব্যবস্থাপনা)

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের চেইন অব কমাণ্ড

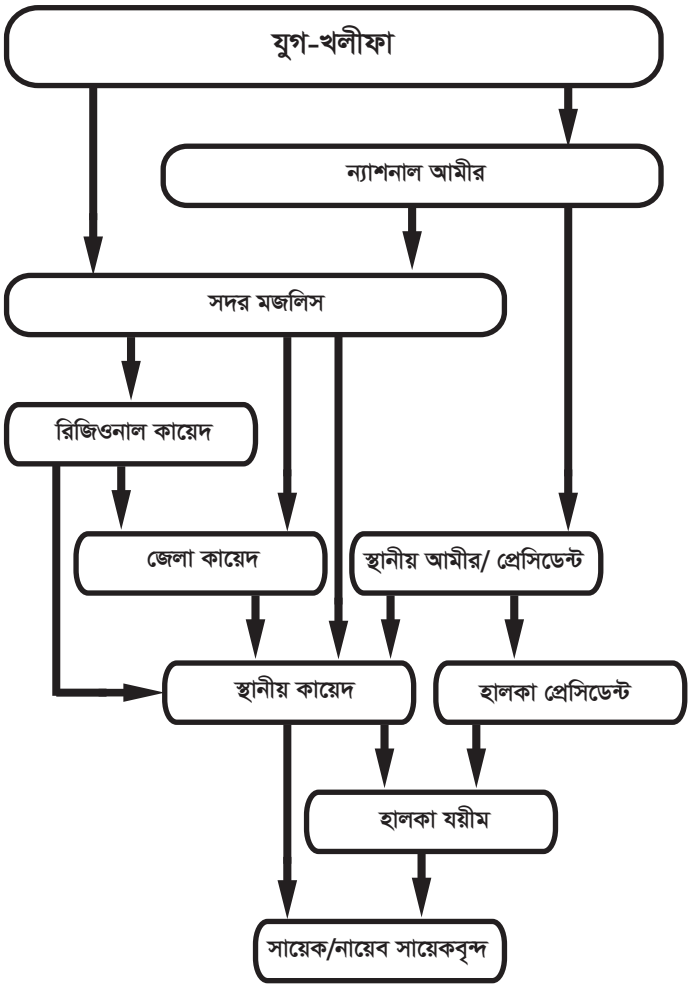

অঙ্গসংগঠনসমূহের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল

১। **লাজনা ইমাইল্লাহ্:** ১৯২২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে আহমদী মহিলোদের জন্য।

২। **নাসেরাতুল আহমদীয়া:** ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী বালিকাদের জন্য।

৩। **মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া:** ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৬ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী যুবকদের জন্য।

৪। **মজলিস আতফালুল আহমদীয়া:** ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী বালকদের জন্য।

৫। **মজলিসে আনসারুল্লাহ্:** ১৯৪০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে আহমদী পুরুষদের জন্য।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। *(৩ বার পড়তে হবে)*

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্মীয়, জাতীয় এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ প্রাণ, ধন, সময় এবং মান-সম্মান কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবো। একইভাবে আহমদীয়া খিলাফতকে অক্ষুন্ন রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবো এবং যুগ-খলীফা যে ন্যায়মীমাংসাই প্রদান করবেন তা পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:

১) খাদেমরা এ আহাদনামা নিজেদের প্রত্যেক সভা ও সমাবেশে একসাথে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন।

২) সভা বা সমাবেশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে দায়িত্বের দিক থেকে যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন।

৩) প্রথমে তাশাহহুদ আরবীতে তিন বার পাঠ করা হবে। তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে। **উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দুতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।**

৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে দাঁড়াতে হবে।

[**খোদ্দামের আহাদনামার উর্দু অংশ:** ম্যাঁ ইকরার কারতা হুঁ কে দীনি, কওমী অওর মিল্লী মুফাদ কি খাতের ম্যাঁ আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর ইয্যাত কো কুরবান কারনে কে

লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গা। ইসি তারাহ্ খেলাফতে আহমদীয়া কে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গা। অওর খলীফায়ে ওয়াক্ত জো ভী মারুফ ফ্যায়স্লা ফারমায়েঙ্গে উসকি পাবন্দী কারনি যারুরী সামঝুঙ্গা, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

আতফালুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। *(৩ বার পড়তে হবে)*

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ধর্ম এবং আহমদীয়াত এবং দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব। সদা সত্য কথা বলব, কাউকে গালি দিব না এবং খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সকল আদেশ পালন করা আবশ্যক জ্ঞান করবো, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতিঃ

১) তিফলরা এটা মুখস্থ করবে।

২) সভা বা সমাবেশে আতফালুল আহমদীয়া বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে যিনি দায়িত্বের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন।

৩) প্রথমে তাশাহহুদ আরবীতে তিন বার পাঠ করার পর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে। **উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দুতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।**

৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে দাঁড়াতে হবে।

[**আতফালের আহাদনামার উর্দু অংশঃ** ম্যাঁ ওয়াদা কারতা হুঁ কে দ্বীনে ইসলাম অওর জামা'তে আহমদীয়া, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গা, হামেশা সাচ বোলুঙ্গা, কিসি কো গালী নেহী দুঙ্গা। অওর হযরত খালীফাতুল মাসীহ্ কি তামাম নাসিহাতোঁ পার আমল কারনে কি কোশেশ কারুঙ্গা, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

মজলিসে আনসারুল্লাহ্র আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। *(৩ বার পড়তে হবে)*

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ও আহমদীয়াতের দৃঢ়তা ও এর প্রচার এবং নেযামে খিলাফতের সংরক্ষণের জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এর

জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। এছাড়া আমার সন্তানসন্ততিদের খেলাফতের প্রতি উৎসর্গীকৃত ও অনুরক্ত থাকতে সর্বদা তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দুতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

[মঁ্যা ইকরার কারতা হুঁ কে ইসলাম অওর আহমাদীয়াত কী মাযবুতী অওর ইশায়াত অওর নেযামে খেলাফত কী হেফাযাত কে লিয়ে ইনশাআল্লাহ্ আখের দাম তাক জাদ্দো জাহদ কারতা রাহুঙ্গা। অওর ইসকে লিয়ে বাড়ী সে বাড়ী কুরবানী পেশ কারনে কে লিয়ে হামেশাহ তাইয়্যার রাহুঙ্গা। নীয আপনে আওলাদ কো ভী হামেশা খেলাফত সে ওয়াবাসতা র‍্যাহনে কী তালকীন কারতা রাহুঙ্গা, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। *(৩ বার পড়তে হবে)*

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্ম ও জাতির স্বার্থে আমার জীবন, সম্পদ, সময় ও সন্তানসন্ততি কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। তদুপরি সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দুতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

[মঁ্যা ইকরার কারতি হুঁ কে আপনি মাযহাব অওর কওম কি খাতের আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর আওলাদ কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গী। নীয সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহুঙ্গী অওর খেলাফতে আহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

নাসেরাতুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। *(৩ বার পড়তে হবে)*

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার ধর্ম, জাতি ও জন্মভূমির সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব, তদুপরি সত্যের ওপরে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দুতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

[ম্যাঁ ইকরার কারতি হুঁ কে আপনি মাযহাব, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হার ওয়াক্ত তাইয়্যার রাহুঙ্গী, নীয সাচ্চায়ী পার হামেশাহ কায়েম রাহুঙ্গী। অওর খেলাফতে আহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী দেনে কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

আমরা কেন চাঁদা দেই?

চাঁদা– আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক আবিষ্কৃত কোনো জিনিস নয় বরং এটি ইসলামের অবশ্যকরণীয় শিক্ষাগুলোর একটি। মনে রাখতে হবে, চাঁদা কোন ট্যাক্স বা কর নয় বরং এটি সেই সমস্ত ফরয কাজগুলোর একটি যেগুলো আদায়ের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। একস্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۔ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٧﴾

"অতএব আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো তোমাদের সাধ্যানুসারে, (তাঁর কথা) শোনো ও আনুগত্য করো এবং (তাঁর পথে) খরচ করো। (এটা) তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম। আর যাকেই তার লোভলালসা থেকে রক্ষা করা হয় তারাই সফল হবে।" *(সূরা আত তাগাবুন: ১৭)*

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۔ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিলে তিনি তা তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি গুণগ্রাহী (ও) পরম সহিষ্ণু।" *(সূরা আত তাগাবুন: ১৮)*

অতএব এসব আয়াত হতে স্পষ্ট, খোদার পথে খরচ করা একজন মু'মিনের জন্য একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। যারা খোদার রাস্তায় খরচ করেন তারাই সফলকাম হন। খোদার রাস্তায় তোমাদের খরচ করা এমন যেন তোমরা আল্লাহ্‌কে কোন ঋণ দিয়েছ এবং আল্লাহ্

তা'লা সেই সত্তা যিনি বান্দাকে তাঁর কুরবানীর প্রতিদানে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয় যারা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় অর্থ ব্যয় করেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে এর প্রতিদান দেন। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী এবং সর্বনির্ভরস্থল। মানুষের টাকাকড়ির তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। মূলত আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, আমাদের আনুগত্যের মান যাচাই করার জন্য, আমাদের তাকওয়ার পথ অন্বেষণ করা, প্রত্যক্ষ করার জন্য, আমাদের আর্থিক কুরবানী করার দাবির প্রকৃত মান দেখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর রাস্তায় খরচ করো, তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য খরচ করো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

"এই গুঢ় তত্ত্বটি প্রত্যেক আহমদীর বুঝা উচিত, আমরা চাঁদা কেন দেই? যদি কেউ সেক্রেটারী মাল বা কোনো জামা'তের প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য বা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকে তাহলে এমন চাঁদা দেয়ার কোনো উপকারিতা নেই বরং না দেয়াই ভালো। যদি অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হয়ে চাঁদা দিয়ে থাকেন তাহলে এরও কোনো লাভ নেই। মোটকথা, যদি চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয় সেক্ষেত্রে এমন চাঁদা খোদা তা'লার কাছে অগ্রহণীয় হতে পারে।

অতএব চাঁদাদাতাদের এমন চিন্তা রাখা উচিত, তারা চাঁদা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এটি তাদের প্রতি খোদা তা'লার একটি পরম অনুগ্রহ। এমন নয় যে, কোনো ব্যক্তির প্রতি বা জামা'তের প্রতি বা আল্লাহ্ তা'লার জামা'তের প্রতি তারা চাঁদা দিয়ে অনুগ্রহ করছেন। অতএব প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে নিজেদের মাঝে এই চেতনা রাখতে হবে যে, তারা চাঁদা দিয়ে খোদা তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টা করছেন। ঐশী জামা'তের জন্য আর্থিক কুরবানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই আমি সকল জামা'তকে বলেছি, নও মোবাঈন এবং শিশুকিশোরদেরও ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় বেশি বেশি অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করুন, এক পয়সা দিয়েও যদি কেউ এতে শামিল হয় হোক। যেন সে অভ্যস্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার আশিস লাভ করতে পারে।"

চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"পৃথিবীতে মানুষ অর্থকে অনেক বেশি ভালোবাসে, আর এ কারণেই স্বপ্নের তাবীরের গ্রন্থে লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে তার কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে এর অর্থ হলো ধনসম্পদ। একারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং ঈমান অর্জনের জন্য বলেছেন, **'লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন।'** *(সূরা আলে ইমরান: ৯৩)*

অর্থ: প্রকৃত পুণ্য তুমি কখনো অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হতে খরচ না করবে। কেননা খোদার সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা এবং আচরণের একটি বড় অংশ অর্থ খরচ করার প্রয়োজন ঘোষণা করে এবং মানুষ ও আল্লাহ্‌র অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা একই জিনিস যা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি

অংশ। এটি ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় হয় না। মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করলে সে অন্যের মঙ্গল সাধন কীভাবে করবে? অন্যের ভালো করা এবং সহমর্মিতার জন্য ত্যাগ স্বীকার একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। আর 'লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন' (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) আয়াত সেই ত্যাগ স্বীকারের প্রতিই নির্দেশ করছে।

আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় অর্থ খরচ করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তার তাকওয়াশীল হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সাব্যস্ত করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গের গুণ ও মান এমন ছিল, যখন মহানবী (সা.) একটি প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি বাড়ীর সব জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।"

এখানে একটি উদাহরণ দিলে আমরা চাঁদা কেন দেই– তা আরো স্পষ্ট হবে। একজন মা তার আদরের সন্তানকে কিছু খাবার কিনে দিয়ে সন্তানের ভালোবাসা দেখার জন্য সন্তানকে বলে, "আমাকে একটু দিবে?" মায়ের এ চাওয়া– জিনিসটি পাওয়ার কোনো আকাঙ্খা থেকে নয় বরং সন্তানের ভালোবাসা পরখ করার জন্য। অসীম মমতা নিয়ে বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র চাঁদা চাওয়া ঠিক একই রকম। সেই বান্দা সৌভাগ্যবান যে তা বুঝতে পেরে সাথে সাথে তা প্রদান করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশের কারণে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানী তথা চাঁদা দিতে হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

যুগে যুগে চাহিদা অনুযায়ী যুগ ইমাম বিভিন্ন চাঁদার তাহরীক করেছেন সেগুলোতেও আহমদীরা সানন্দে চাঁদা দিয়ে থাকেন। এর মাঝে কিছু চাঁদা আছে আবশ্যক যেমন,

১. প্রত্যেক উপার্জনকারী তার আয়ের কমপক্ষে ১৬ ভাগের ১ ভাগ চাঁদা প্রতিমাসে দিবে। এটিকে বলা হয় চাঁদা আম বা সাধারণ চাঁদা। তবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়্যতের যে তাহরীক করে গেছেন কেউ যদি নিজের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখিয়ে সেই ওসীয়্যত করতে চায় তাহলে তাকে ১৬ ভাগের ১ ভাগ-এর স্থলে কমপক্ষে ১০ ভাগের ১ ভাগ চাঁদা প্রদান করতে হয়। এ চাঁদাকে বলে হিস্যায়ে আমদ। আর প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীকে তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির কমপক্ষে ১০ ভাগের ১ ভাগ চাঁদা হিসাবেও দিতে হয়। আর একে বলা হয় হিস্যায়ে জায়েদাদ।

২. জলসার চাঁদাও একটি লাযেমী বা বাধ্যতামূলক চাঁদা। উপার্জনশীল ব্যক্তিকে তার আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ অর্থ ১২ মাসে পরিশোধ করতে হবে।

৩. এছাড়া উপরুল্লিখিত বয়সের ভিত্তিতে জামা'তের ৫টি অঙ্গসংগঠনের সদস্য হিসাবে সদস্য চাঁদা দিতে হয়। এ চাঁদা উপার্জনকারী এবং অ-উপার্জনকারী সকলকে দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অফিস থেকে এর বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।

তাহরীকে জাদীদ (নতুন ঘোষণা)

১৯৩৪ সনে যখন জামা'তে আহরারী জামা'ত ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী শক্তি কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং পৃথিবী হতে আহমদীয়াতকে নির্মূল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখন তাদের এ মিথ্যা অহমিকাকে ধূলিস্যাৎ করে দিতে ঐশী ইঙ্গিতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। হুযূর (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ২৭টি মোতালেবা (দাবি) পেশ করেন, যথা: (১) সরল জীবনযাপন করা, এ উদ্দেশ্যে– (ক) এক খাদ্য ও এক তরকারি ব্যবহার করা (বাঙালিদের জন্য এর অতিরিক্ত হিসাবে ডাল ব্যবহার করার অনুমতি আছে), (খ) পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব কম ক্রয় বা প্রস্তুত করা, (গ) মহিলাদের নতুন অলংকার প্রস্তুত বা লেসফিতা, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী ক্রয় করা হতে বিরত থাকা, (ঘ) চিকিৎসা খরচ লাঘব করা, পারতপক্ষে বেশি মূল্যের পেটেন্ট ঔষধ ক্রয় না করা, (ঙ) সিনেমা, বায়োস্কোপ ইত্যাদি রংতামাশা বর্জন করা, বিবাহের খরচাদি সাশ্রয় করে কেবল যা একেবারে অপরিহার্য তা করা, (ছ) বৃথা সাজসরঞ্জাম বা আসবাবপত্র হতে বিরত থাকা, (জ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খরচ যথাসম্ভব কম করা (২) মাসিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পর্যন্ত পরবর্তী তিন বছর তাহরীকে জাদীদের আমানত ফান্ডে জমা করা, (৩) বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রচারের জবাব দেয়ার জন্য জামা'তের ফান্ডে চাঁদা দেয়া, (৪) বহির্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য চাঁদা দেয়া, (৫) তবলীগের বা ইসলাম প্রচারের বিশেষ স্কিমের জন্য চাঁদা দেয়া, (৬) সাইকেল যোগে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাঁদা দেয়া (৭) চাকুরিজীবীদের ছুটি প্রাপ্য থাকলে তিন মাসের ছুটি নিয়ে তবলীগি কাজে উৎসর্গ করা, ব্যবসায়ী বা কৃষকদের অবসরকাল তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা (ছ) গ্রীষ্মের, পূজার বা বড় দিনের ছুটি তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা, (৮) যুবকদের তিন বছরের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করা, (১০) সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের বক্তা বা সম্মানিত প্রচারকরূপে পেশ করা, (১১) ২৫ লক্ষ টাকার রিজার্ভ ফান্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, (১২) পেনশনপ্রাপ্ত লোকদের নিজেদেরকে সিলসিলার কাজের জন্য পেশ করা, (১৩) সংগতিশীল ব্যক্তিদের সন্তানদেরকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান প্রেরণ করা, (১৪) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র হতে ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ নেয়া, (১৫) যুবকদের বিদেশে গিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে তবলীগ করা, (১৬) নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা, (১৭) বেকাররা যেন অবিলম্বে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র বৈধ কাজে নিয়োজিত হয়, (১৮) কাদিয়ানে বাড়ি প্রস্তুত করার চেষ্টা করা, (১৯) এ তাহরীকের সাফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা (২০) ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতাকে সমুন্নত রাখা, (২১) মহিলাদের অধিকার ও আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, (২২) প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণভাবে আমানতদার (বিশ্বস্ত) হবে আর কারো আমানত খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করবে না, (২৩) খোদার সৃষ্টির সেবা করা, নিজ হাতে কাজ করে নিজের গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি, (২৪) প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা উচিত, সরকার বাধ্য

না করলে আদালতে কোনো (দেওয়ানী) মোকদ্দমা দায়ের করবে না বরং তাদের মোকদ্দমা নিজস্ব আদালত বোর্ড বা কাযা বোর্ডে পেশ করবে আর এর রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখবে (২৫) সন্তানদেরকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করা, (২৬) সম্পত্তি ও আয় ওয়াকফ (উৎসর্গ) করা, (২৭) হিলোফুল ফুযুলের ন্যায় সমিতি গঠন করা। বর্তমানে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কোনো নির্ধারিত হার নেই। তবে আবালবৃদ্ধবণিতা প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা আয় করে তাদেরকে মাসিক আয়ের একটি বিশেষ অংশ এ খাতে সারা বছর আদায় করা উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এ তাহরীকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। সেই সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরি করি নি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রণয়ন করেছেন।" *(আল্ ফযল, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫)*

আজ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম সমগ্র বিশ্বের ২১৪টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এর গোটা কৃতিত্বই তাহ্রীকে জাদীদের বললে অত্যুক্তি হবে না। এ তাহরীকে জাদীদ এবং নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার (নেযামে নও) প্রবর্তন হতে যাচ্ছে। দিকচক্রবালে আমরা ঊষার সোনালী কিরণের ন্যায় তা দেখতে পাচ্ছি।

ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ)-এর ঘোষণা দেন। প্রাথমিকভাবে এ তাহরীকের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গোটা উপমহাদেশের জামা'তগুলোর সদস্যদেরকে সঠিকভাবে ত ালীম ও তরবিয়ত দেয়া। এ লক্ষ্যেই প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয় যারা গ্রামেগঞ্জে গিয়ে মানুষের তরবিয়ত করবে। জন্মলগ্নে এ তাহরীকের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য হুযূর (রা.) বলেন, "এ তাহরীককে অব্যাহত রাখার জন্য আমার গায়ের কাপড়চোপড়ও বিক্রয় করতে হলে আমি তা করতে দ্বিধা করবো না।" তরবিয়ত ও তবলীগের ময়দানে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেমরা যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সনে ওয়াকফে জাদীদের পরিসরকে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত করেন। *(দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান, পৃ. ৫৭)*

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারণ করেছিলেন ১ পাউন্ড বা এর সমপরিমাণ (বর্তমানে বাংলাদেশী টাকার প্রায় ১১০/- টাকা)। কিন্তু পরে তিনি এ নির্ধারিত হার প্রত্যাহার করেছেন। এখন জামা'তের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাইকে এমনকি সদ্যজাত শিশুকে পর্যন্ত আর্থিক কুরবানীতে শামিল করার নির্দেশ রয়েছে, তা যত নগণ্য পরিমাণই হোক না কেন। নও মোবাঈন তথা নবদীক্ষিতদেরকেও যেন এ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ জন্যে খিলাফত থেকে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে আর তাদেরও উচিত তারা যেন সাধ্যমত এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করে।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজাদ্দেদগণের নাম*

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)	২য়	হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও হযরত ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বল (রহ.)	৩য়	হিজরী শতাব্দী
হযরত আবু শরাহ (রহ.) ও হযরত আবুল হাসান আশ 'আরী (রহ.)	৪র্থ	হিজরী শতাব্দী
হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ্ নিশাপুরী (রহ.) ও হযরত কাজী আবু বকর বাকলীন (রহ.)	৫ম	হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) হযরত সৈয়দ আবদুল কাদীর জিলানী (রহ.)	৬ষ্ঠ	হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি আজমীরী (রহ.)	৭ম	হিজরী শতাব্দী
হযরত হাফিজ ইবনে হাযর আসকালানী (রহ.) ও হযরত সালেহ্ বিন ওমর (রহ.)	৮ম	হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম সিউতি (রহ.)	৯ম	হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহ.)	১০ম	হিজরী শতাব্দী
হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানি সৈয়্যদ আহ্মদ সারহিন্দী (রহ.)	১১শ	হিজরী শতাব্দী
হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দীস দেহলোবী (রহ.)	১২শ	হিজরী শতাব্দী
হযরত সৈয়্যদ আহ্মদ বেরেলবী (রহ.)	১৩শ	হিজরী শতাব্দী

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শিরোভাগে একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করেন। উক্ত শতাব্দীতে অন্য কেউ মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করেন নি। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দেদ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)। বস্তুতঃ তাঁর মাধ্যমে সূরা আন নূর-এর "আয়াত-এ-ইস্তেখলাফ' (২৪:৫৬)-এর 'খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়া' (নবুওয়তের ধারায় খিলাফত) হাদীস অনুযায়ী ইসলামে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ খিলাফত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত জারি ও কায়েম থাকবে।

** নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ কর্তৃক ১২৯১ হিজরী সনে রচিত 'হুজাজুল কিরামা ফী আসারিল্ কিয়ামাহ্ পুস্তক দ্রষ্টব্য।*

'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিস বর্ষণ করব যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।' *ইলহাম– হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)*

(আল্-ওসীয়্যত, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

(হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্সালাম কর্তৃক প্রণীত)

(১) বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে বিরত থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

(৩) খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচবেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং প্রত্যহ নিজ পাপসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও এস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালোবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

(৪) প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনোভাবে অন্যায় কোনো কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সর্বাবস্থায় ও সর্ব পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

(৬) সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করবে।

(৭) অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

(১০) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ বা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনে এবং তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ই জানুয়ারি, ১৮৮৯)

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

১। আমরা কি বয়আতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শিরক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামা'তের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছর আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লীল চিন্তাধারার উদ্রেক করে-আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমন সব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হয় তবে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পরনিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী (সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরের অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরীর নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী (সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা এবং বদভ্যাস ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগব্যাধি থেকেও এটি মানুষকে রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরূদ শরীফ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মু'মিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তণের অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপনপর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়-আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়- আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসুলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে- সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহ্‌কে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশনাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হলো সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছর আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মচর্চায় অগ্রসর হতে এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলিসর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধনসম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মানসম্ভ্রমের চেয়েও বেশি মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়জিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তানসন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তানসন্ততিকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

নও মোবাঈন অর্থাৎ নতুন বয়আতকারীদের করণীয়

- **বয়আতের ১০টি শর্ত পড়া, অভিনিবেশ করা ও কতটুকু বাস্তবায়ন করছেন এর হিসাব নেয়া।**
- **নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া।**
- **নিয়মিত অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করা।**
- **নিয়মিত হাদীস পাঠ করার চেষ্টা করা।**
- **মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত বই নিয়মিত পড়া।**
- **জামা'তের অত্যাবশ্যকীয় চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া।**
- **নিয়মিত এমটিএ তে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শোনা।**
- **জলসা ও ইজতেমাসহ জামা'তের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।**
- **কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।**
- **হুযূর (আই.)-এর নিকট নিয়মিত দোয়ার চিঠি প্রেরণ করা।**
- **সর্বাবস্থায় দোয়া ও দরূদ পড়ায় অভ্যস্থ হওয়া।**
- **নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার চেষ্টা করা।**
- **কুরআন, সুন্নাহ ও বয়আতের ১০টি শর্তের আলোকে জীবনযাপন করা।**

–সমাপ্ত–

LOVE
FOR ALL
HATRED
FOR NONE

“যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে
জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না”

– হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ

Nau-Moba'yeen Guide Book

Compiled by
Md. Ilias Hossain
Mohtamim Nau Moba'yeen

Published by
Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publication Ltd. U.K.

ISBN 978-984-994-005-0
978 984 994 005 0